Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাসুল ﷺএর সিরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ নাছিমা খাতুন

রোলঃ 23090120279

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাসুল ﷺএর সিরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ নাছিমা খাতুন

রোলঃ 23090120279

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রাসুল ﷺএর সিরাহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ নাছিমা খাতুন, আইডিঃ 23090120279 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রাসুল ﷺএর সিরাহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নাছিমা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোছাঃ নাছিমা খাতুন

আইডিঃ 23090120279

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১:ভূমিকা 6

অধ্যায় ২: রাসুল ﷺএর জন্ম ও প্রারম্ভিক জীবন.. 8

অধ্যায় ৩: নুবুওয়াতের পূর্ব জীবন 20

অধ্যায় ৪: নুবুওয়াত ও মাক্কি জীবন 36

অধ্যায় ৫: মদীনা যুগ 59

অধ্যায় ৬:নবীজির যুদ্ধ জীবন.. 67

অধ্যায় ৭:নবিজীর পরিবার,গুন ও আখলাক 115

অধ্যায় ৮:সিরাতে থেকে শিক্ষা.. 129

অধ্যায় ৯: উপসংহার 131

অধ্যায় ১:ভূমিকা

গবেষণার পটভূমি

মানবজাতির ইতিহাসে অসংখ্য মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন মানবতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। আল্লাহ তাআলা তাঁকে "رحمة للعالمين" তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন (আল-আম্বিয়া: ১০৭)। তাই রাসূল ﷺ এর জীবন বা সিরাহ অধ্যয়ন করা শুধু ইসলামের মৌলিক অংশই নয়, বরং বর্তমান সমাজ ও মানবতার জন্য দিকনির্দেশনা।

গবেষণার গুরুত্ব

আধুনিক যুগে মানুষ নানা সমস্যার সম্মুখীন—নৈতিক সংকট, পারিবারিক ভাঙন, নেতৃত্বহীনতা, সহিংসতা ইত্যাদি। এসব সমস্যার সমাধান রাসূল ﷺ এর সিরাতে পাওয়া যায়। তাঁর জীবন অধ্যয়ন করলে আমরা জানতে পারি কিভাবে একজন ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সফল হতে পারে। তাই এই গবেষণার মাধ্যমে সিরাহকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই থিসিসের মূল উদ্দেশ্য হলো:

1. রাসূল ﷺ এর জীবন ও চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো বিশ্লেষণ করা।

2. তাঁর দাওয়াতি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিষয় বের করা।

3. আধুনিক সমাজে রাসূল ﷺ এর শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা।

গবেষণার প্রশ্ন

রাসূল ﷺ এর সিরাহ থেকে কোন কোন শিক্ষণীয় দিক আমরা গ্রহণ করতে পারি?

বর্তমান সামাজিক সংকটে সিরাহ কিভাবে দিকনির্দেশনা দিতে পারে?

সিরাহ অধ্যয়নের একাডেমিক ও প্রায়োগিক মূল্য কী?

পূর্ববর্তী গবেষণা পর্যালোচনা

সিরাহ বিষয়ে বহু আলেম ও গবেষক কাজ করেছেন। যেমন:

সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া : রাসূল ﷺ এর জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ।

রাসুলে আরাবি : আরব সমাজে নবীর জীবনের ভূমিকা।

নবিয়ে রহমত : রাসূল ﷺ এর দাওয়াতি ও আখলাকি দিকের ওপর জোর দেয়।

সিরাতুন নবী ﷺ : ইতিহাসনির্ভর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।
এছাড়াও আর-রাহীকুল মাখতুম, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া প্রভৃতি গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research Method) অনুসরণ করা হয়েছে। উল্লেখিত গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি কুরআন ও হাদিস থেকেও প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি আনা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণায় রাসূল ﷺ এর সম্পূর্ণ জীবনের পরিবর্তে নির্বাচিত কিছু দিক— যেমন দাওয়াত, নেতৃত্ব, পরিবার ও সামাজিক জীবন— এর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ সিরাহ নয়, বরং নির্বাচিত বিষয়ের একটি একাডেমিক বিশ্লেষণ।

অধ্যায় 2: রাসুল ﷺএর জন্ম ও প্রারম্ভিক জীবন

আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

রাসূল ﷺ এর জন্মের পূর্বে আরব সমাজ ছিল অরাজকতায় পূর্ণ। গোত্র ভিত্তিক দ্বন্দ্ব, হত্যা-রক্তপাত, নারীকে অবমাননা, মদ ও জুয়া তাদের সমাজকে কলুষিত করেছিল। মক্কার কুরাইশ গোত্র কাবা শরীফের সেবার কারণে আরবের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা ভোগ করত। তবে ধর্মীয় দিক থেকে তারা শিরক ও মূর্তিপূজার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল ।

রাসূল (ﷺ) এর জন্মপূর্ব বরকতের সুবাস

প্রভাত হওয়ার আগে সুবহে সাদিকের আলো এবং রক্তিম পুবাকাশ যেমন পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল সূর্যোদয়ের জানান দেয়, তেমনি নবুওয়াতি সূর্যের উদয়-মুহূর্ত যখন একেবারে নিকটে, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল, যা রাসূল (ﷺ) এর শুভ জন্মের আগমনী-সংবাদ দিচ্ছিল। মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদদের পরিভাষায় সেগুলোকে 'ইরহাসাত' বা অপেক্ষমাণ নিদর্শন বলা হয়।

রাসূল (ﷺ) এর সম্মানিত মা আমিনা থেকে বর্ণিত; রাসূল (ﷺ) যখন তাঁর মাতৃগর্ভে, তখন আমিনাকে স্বপ্নে সুসংবাদ দেওয়া হয়- 'তোমার গর্ভে যে শিশু রয়েছে, সে এ উম্মাহর নেতা হবে। শিশুটি যখন ভূমিষ্ঠ হবে, তখন তুমি এ দুআ করবে-“আমি তাঁকে এক আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করছি" এবং তাঁর নাম রাখবে মুহাম্মাদ।'

আমিনা আরও বলেন, মুহাম্মাদ যখন আমার গর্ভে আসেন, তখন আমি একবার এমন একটি আলো দেখতে পাই, যে আলোতে শামের বসরা শহরের বড় বড় প্রাসাদ আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল!

তিনি আরও বলেন, আমি এমন কোনো মহিলাকে দেখিনি, যারা গর্ভবতী হয়ে আমার মতো এত হালকা ও সহজবোধ করেছেন। কেননা, গর্ভে সন্তান থাকলে মহিলাদের যে বমি বমি ভাব, অসুস্থতা-অলসতা ইত্যাদি বিষয় পরিলক্ষিত হয়, আমার ক্ষেত্রে সে রকম কিছুই হয়নি। এ ছাড়া এমন আরও অসংখ্য ঘটনা নবিজির জন্মের আগে প্রকাশ পেয়েছে-

সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) এর জন্মের সময় তাঁর সম্মানিত মায়ের উদর থেকে এমন একটি নূর প্রকাশিত হয়েছিল, যার আলোয় পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যায়। এ ছাড়া কোনো বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ﷺ) তাঁর জন্মের সময় দুহাতের ওপর ভর দেওয়া ছিলেন। এরপর হাতে একমুঠো মাটি নিয়ে আকাশের দিকে তাকান। (সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া ﷺ)

জন্ম ও বংশ পরিচিতি

রাসূল ﷺ এর জন্ম হয় আমুল ফীল বছরে (মোতাবেক ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ) রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে সোমবার দিন মক্কায় । এটি ছিল মানবতার ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও বরকতময় দিন।তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এবং মাতার নাম আমিনা বিনতে ওহাব।

জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করেন এবং ছয় বছর বয়সে মাতা মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তিনি অল্প বয়সেই এতিম হয়ে যান।

(নবীয়ে রহমত ﷺ , পৃষ্ঠা-১২১)।

রাসূল (ﷺ) এর পবিত্র বংশধারা পৃথিবীর সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাশীল। এটি এমন এক বাস্তব সত্য যে, মক্কার সকল কাফির এমনকি তাঁর চরম শত্রুও তা অস্বীকার করতে পারেনি। আবু সুফিয়ান রা. ইসলামগ্রহণের আগে রোম সম্রাটের সামনে এ সত্য গোপন করতে পারেননি; বরং সত্যটাই স্বীকার করতে হয়েছিল তাঁকে। অথচ তখন তিনি মনে মনে চাচ্ছিলেন, যদি কোনো সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে রাসূল (ﷺ) এর ওপর কোনো না কোনো দোষ চাপাবেন।

রাসূল (ﷺ) এর বংশধারা

পিতার দিক থেকে রাসূল (ﷺ) এর বংশপরিক্রমা

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু আবদি মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব ইবনু মুররা ইবনু কাআব ইবনু লুওয়াই ইবনু গালিব ইবনু ফিহর ইবনু মালিক ইবনু নাজার ইবনু কিনানা ইবনু খুজায়মা ইবনু মুদরিকা ইবনু ইলয়াস ইবনু নিজার ইবনু মাআদ ইবনু আদনান।

এ পর্যন্ত রাসূল (ﷺ) এর বংশধারা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত ও প্রমাণিত। এর পর থেকে আদম আ. পর্যন্ত তাঁর বংশধারা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, তাই সেটুকু আর উল্লেখ করা হলো না।

মায়ের দিক থেকে রাসূল (ﷺ) এর বংশপরিক্রমা

মুহাম্মাদ ইবনু আমিনা বিনতু ওয়াহাব ইবনু আবদি মানাফ ইবনু জুহরা ইবনু কিলাব।
উপরিউক্ত আলোচনার পর জানা গেল যে, কিলাব ইবনু মুররা পর্যন্ত পিতা-মাতার দিক থেকে বংশপরিক্রমা ভিন্ন হলেও এর পর থেকে একসঙ্গে মিলে গেছে।

রাসুল ﷺএর জন্ম হতেই মা আমিনা এই সংবাদ দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে পাঠান। সংবাদ পেতেই তিনি ছুটে আসেন , পরম স্নেহে দেখেন, যত্নের সঙ্গে কলে তুলে নিয়ে কাবার ভিতর প্রবেশ করেন , আল্লাহ তায়ালার হামদ বর্ণনা করেন এবং দোয়া করেন । এরপর তার নাম লেখেন মোহাম্মদ। আরবে এ নাম ছিল একেবারেই নতুন। ফলে লোক খুব বিস্মিত হয়।
(নবীয়ে রহমত ﷺ পৃষ্ঠা ১২১)

মুহাম্মদ ﷺ - এর দুধপান

রাসূল (ﷺ) এর জন্মের পর প্রথমে তাঁর সম্মানিত মা তাঁকে দুধপান করান। এর কিছুদিন পর করান আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবা। এরপর এই সৌভাগ্য অর্জন করেন হালিমাতুস সাদিয়া (রা.)।
[সিরাতে মুগলতাই]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মা আমিনার দুধ পান করানোর সাথে সাথে চাচা আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবাও তাকে দুধ পান করান।সে সময় রাসুল ﷺএর সাথে তার সন্তান মাসরূহ ও দুধ পান করছিলো । এর আগে হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এবং আবু সালামাকেও সুওয়াইবা দুধ পান করিয়েছিলেন। ফলে তারা তিনজন মুহাম্মদ ﷺ এর দুধ ভাই হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

(রাসুলে আরবী ﷺ পৃষ্ঠা ২৭)

হালিমা সা'দিয়ার কোলে নবীজী

কয়েকদিন পর্যন্ত তার চাচা আবু লাহাবের বাদী সুওয়াইবা তাকে দুধ পান করানোর পর আব্দুল মুত্তালিব নিজ পৌত্রের জন্য (এত বেশি ভালোবাসা ও স্নেহের পাত্র তার সন্তানদের মধ্যে আর কেউ ছিল না) কোন দেহাতী সন্ধান করতে থাকেন। আরবদের একটি প্রথা ছিল শহরের খারাপি থেকে বাঁচানোর জন্য শিশু সন্তানকে দুধ পান করাতে বেদুইন নারীদের তত্ত্বাবধানে রাখা। তারা সন্তানকে শক্তিশালী সুঠাম করে তোলার জন্য মাতৃভূমির প্রাকৃতিক ও রুক্ষ পরিবেশে পাঠিয়ে দিত। তাছাড়া সারা আরবে বেদুইনদের ভাষাটাই ছিল আরবের বিশুদ্ধতম রুপ। ফলে তাদের সাথে বেড়ে ওঠা শিশুরা সহজেই প্রমিত আরবি ভাষা শিখতে পারতো। আর শহরে বিভিন্ন মানুষের বসবাসের কারণে ভাষাও মিশ্র হয়ে যায়, তাই বিশুদ্ধ রূপ আর থাকে না।
তখনকার আরবের সম্ভ্রান্ত লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের নবজাতককে দুধপান করাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামে পাঠিয়ে দিতেন। এর মাধ্যমে শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য ভালো থাকত এবং গ্রামের বিশুদ্ধ আরবি ভাষাও তারা সহজে রপ্ত করতে পারত। এ জন্য গ্রামের মহিলারা দুগ্ধপোষ্য শিশু নিতে প্রায়ই শহরে আসত।

রাসূল (ﷺ) এর দুধমা হালিমা সাদিয়া রা. বলেন, 'আমি তায়েফ থেকে সাআদ গোত্রের মহিলাদের সঙ্গে দুগ্ধপোষ্য শিশু সংগ্রহের জন্য মক্কার উদ্দেশে রওনা দিই। সে বছর দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল। তখন আমার কোলেও দুগ্ধপায়ী এক সন্তান ছিল। তবে আমরা বেশ দারিদ্র্যপীড়িত ছিলাম। অনাহারের ফলে আমার বুকে এতটুকু দুধ ছিল না যে, আমার কোলের শিশুটি তৃপ্তিতে পান করবে। ফলে শিশুটি সারা রাত ক্ষুধায় ছটফট করত; আর আমরা তার কারণে ঘুমোতে পারতাম না। সারাটি রাত বসে বসে কাটিয়ে দিতাম। আমাদের একটি উটনী ছিল; কিন্তু সেটিরও তখন দুধ ছিল না। এভাবে কষ্ট ও ক্ষুধায় আমরা দিন কাটাতাম। এতকিছুর পরও আমরা দুগ্ধপোষ্য শিশু নেওয়ার মনস্থ করি।

মক্কার উদ্দেশে রওনার সময় আমি যে গাধায় আরোহণ করি, সেটাও নিতান্ত দুর্বল ছিল। ফলে কাফেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না। এ জন্য সফরসঙ্গীরা আমাদের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করছিল। এভাবে অনেক কষ্টে একপর্যায়ে আমরা মক্কায় পৌঁছাই।

সেখানে পৌঁছার পর কাফেলার মহিলারা শিশু মুহাম্মাদকে দেখার পর যখন জানতে পারে, তিনি পিতৃহীন ইয়াতিম, তখন কেউ-ই তাঁকে নিতে চায়নি। কেননা, এ ধরনের শিশুকে দুধপান ও লালনপালনে তেমন কোনো পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

এভাবে একে একে মহিলারা চলে যেতে লাগল; আর হালিমার ভাগ্যাকাশে ঝলমল করে নববি কিরণ আলো ছড়ায়। এ সময় তাঁর বুকের দুধস্বল্পতাই তাঁর জন্য রহমত হয়ে আবির্ভূত হয়। কেননা, তাঁর বুকে দুধ কম থাকায় ইতিপূর্বে কেউ তাঁকে সন্তান দিতে রাজি হয়নি।
হালিমা বলেন, 'আমি আমার স্বামীকে বললাম, এত কষ্টের সফরের পর খালি হাতে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। এভাবে ফিরে যাওয়ার চেয়ে বরং এই ইয়াতিম শিশুকে নিয়ে যাওয়াই ভালো। আমার প্রস্তাবে স্বামীও সম্মত হলেন।' এভাবে তাঁরা এই দুর্লভ রত্ন-ইয়াতিম শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে বাড়িতে ফেরেন, যে রত্ন-আলোতে শুধু হালিমা- আমিনার ঘর নয়; বরং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো পৃথিবী আলোকিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল।

আল্লাহ তাআলার রহমতে তখনই হালিমার ভাগ্য খুলে যায়। সৃষ্টির সেরা মানব, ভবিষ্যৎ-নবি মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর কোলে এসে গেলেন। এরপর বিশ্রামের জন্য তাঁবুতে এসে যখন শিশু মুহাম্মাদ (ﷺ) কে দুধ পান করাতে বসেন, তখন থেকেই বিভিন্ন বরকত প্রকাশ পেতে শুরু করে। ইতিপূর্বে তাঁর বুকে যেখানে দুধ-খরা চলছিল, সেখানে আজ শিশু মুহাম্মাদ (ﷺ) এর বরকতে এই পরিমাণ দুধ এল যে, রাসূল (ﷺ) ও তাঁর দুধভাই আবদুল্লাহ উভয়ে তৃপ্তির সঙ্গে

উদর পূর্ণ করে ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে উটনীর দিকে তাকিয়ে দেখা গেল, সেটিরও স্তন দুধে টইটম্বুর!

হালিমা বলেন, আমার স্বামী তখন উটের দুধ দোহন করেন এবং আমরা সবাই তৃপ্তির সঙ্গে তা পান করি। ফলে অনেক দিন পর সারা রাত আমরা অত্যন্ত আরামে ঘুমিয়ে কাটাই। এখন আমার স্বামীও আমাকে বলতে থাকেন, 'হালিমা, তুমি তো বড় বরকতময় এক শিশু নিয়ে এসেছ!' আমি বলি, আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। এ শিশু বরকতপূর্ণ এক শিশু।

এর পর আমরা মক্কা থেকে রওনা দিই। আমি মুহাম্মাদকে নিয়ে সেই গাধায় চড়ি, যেটি আসার সময় চলতে পারছিল না; কিন্তু এবার আল্লাহর কুদরতের খেলা প্রত্যক্ষ করলাম। সেই দুর্বল গাধাটিই ফেরার পথে এত জোরে চলতে লাগল যে, কাফেলার অন্য কারও বাহন এটির ধারেকাছেও আসতে পারছিল না। ফলে আমার সাথি মহিলারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতে থাকে, 'এটা কি সেই গাধা, যেটিতে চড়ে তোমরা এসেছিলে?'

এভাবে বরকত ও কুদরতের খেলা দেখতে দেখতে একসময় সফর সমাপ্ত হলো। তায়েফ থেকে মক্কা হয়ে আবারও তায়েফে নিজ নিজ বাড়িতে এলাম সবাই। তায়েফে তখনো দুর্ভিক্ষ চলছিল। দুধের পশুগুলো ছিল দুধশূন্য; কিন্তু আমরা বাড়িতে ফিরতেই আমাদের বকরিগুলোর স্তন দুধে ভরে ওঠে। এখন প্রতিদিনই আমাদের বকরিগুলো মাঠ থেকে দুধভরা স্তনে ফেরে; কিন্তু আশেপাশের অন্য কারও পশুর স্তনে একফোঁটা দুধের দেখা নেই। এ দৃশ্য দেখে আমার গোত্রের লোকেরা তাদের রাখালদের বলতে লাগল, তোমরাও পশুগুলো নিয়ে সেখানে চরাও, যেখানে হালিমার বকরিগুলো চরানো হয়। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, এখানে চারণক্ষেত্র বা মাঠের কোনো বিশেষত্ব ছিল না; বরং এই বরকত-খেলার মাধ্যমে এখানে অন্য এক রত্নের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া ছিল উদ্দেশ্য। তারা সেই রত্ন পাবে কোথায়? ফলে একই মাঠে চরার পরেও দেখা যায়, তাদের পশুগুলো দুধশূন্য আর আমারগুলো দুধপূর্ণ!

এভাবেই আমরা প্রতিনিয়ত নবিজি (ﷺ) এর বরকত প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। দেখতে দেখতেই দু-বছর পেরিয়ে যায়, এরপর শিশু মুহাম্মাদকে আমি বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দিই।

[(নবীয়ে রহমত ﷺ ;সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া ﷺ)]

রাসূল (ﷺ) এর প্রথম কথা

হালিমাতুস সাদিয়া রা. বলেন, 'আমি যখন নবিজিকে দুধ পান ছাড়াই, তখন তাঁর পবিত্র জবানে এ কথাগুলো উচ্চারিত হতো,

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও মহান। সব প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তাআলা সব ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে পবিত্র।

শিশু মোহাম্মদকে বুকে রাখতে হালিমার বিকুলতা

শিশুবয়সে রাসূল (ﷺ) এর দৈহিক বৃদ্ধি অন্যান্য শিশুর চেয়ে অনেক ভালো ছিল। ফলে মাত্র দু-বছর বয়সেই তাঁকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখাত।
বাইরে যেতেন এবং ছেলেদের খেলাধুলা দেখতেন, তবে তিনি খেলতেন না; বরং চুপচাপ ও একাকী থাকতেন। মুহাম্মাদ (ﷺ) একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার অপর ভাইকে সারা দিন দেখতে পাই না, সে কোথায় থাকে?' আমি বললাম, 'সে বকরি চরাতে যায়।' তিঁনি বললেন, 'আমাকেও তাঁর সঙ্গে পাঠাবেন।' এরপর থেকে মুহাম্মাদও তাঁর দুধভাই আবদুল্লাহর সঙ্গে বকরি চরাতে যেতেন।

ছয় মাস পরপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার মা ও পরিবারের সাথে দেখা করাতে নিতেন হালিমা। দু'বছর পর যখন দুধ ছাড়ানো হয় তখন সারা জীবনের তরে তাদের ছেলেকে পরিবারের কাছে দিয়ে আসার সময় আসে। হালিমা এবার শিশুকে মায়ের কাছে নেওয়ার পর ব্যাকুল হয়ে খুব করে অনুরোধ করেন যেন আরো কিছুকাল তাকে রাখতে দেয়।
কারণ যে কল্যাণ ও নিয়ামতের ছোয়া তারা পেয়েছিল তা অবর্ণনীয় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাকে বলেন যে , সে মরুভূমিতে শক্ত -সামর্থ্যবান- সুঠাম হয়ে বেড়ে উঠবে। এমনিতেও মক্কায় অহরহ মহামারী লেগেই থাকে। তা থেকেও দূরে থাকতে পারবে। আমিনার সম্মতিতে খুশি মনে শিশুকে নিয়ে ফিরে আসেন হালিমা।

আরো দু'বছর পর এক অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা ঘটে যা দেখে হারিসা হালিমা দম্পতি খুব ভয় পেয়ে যান। তাদের অতি প্রিয় মুহাম্মদকে মক্কায়-মায়ের কাছে রেখে আসেন।

বক্ষবিদারণ :অলৌকিক ঘটনা

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আনাস ইবনে মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু)। হালিমার ঘরের কাছেই একদিন মুহাম্মদ ﷺ অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন এমন সময় ফেরেশতা জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এসে তাকে শোয়ান। তারপর বালক মোহাম্মদের বুক চিরে তার হৃদপিণ্ড বের করে আনেন। সেখান থেকে এক টুকরো মাংস ফেলে দিয়ে বলেন আপনার মাঝে ওটা ছিল শয়তানের অংশ এরপর তিনি হৃদপিন্ডটি জমজমের পানিতে পূর্ণ একটি স্বর্ণপাত্রে রেখে ধৌত করেন। তারপর সেই পরিচ্ছন্ন অন্তর পুন:স্থাপিত করেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষে।

তখন অন্য বাচ্চারা আতঙ্কে কান্না করতে করতে দৌড়ে যায় হালিমার কাছে। গিয়ে বলে মোহাম্মদকে হত্যা করে ফেলেছে। হারিস হালিমা দম্পতি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে বালক মোহাম্মদ কে জীবিত দেখতে পান। কিন্তু তার চেহারা ভয়ে একেবারে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'বাবা, কী হয়েছে?' তিনি বলেন, 'সাদা পোশাক পরা দুজন লোক এসে আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন এবং আমার পেট চিরে তা থেকে কী যেন বের করলেন। আমি জানি না সেটা কী?' তখন আমরা তাঁকে ঘরে নিয়ে আসি।

[সিরাতে ইবনু হিশাম]

এরপর আমরা তাঁকে এক গণকের কাছে নিয়ে যাই। গণক তাঁকে দেখামাত্রই আসন থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং তাঁকে বুকে জড়িয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'হে আরববাসী, তোমরা কোথায়? দ্রুত এসো। যে বিপদ অচিরেই তোমাদের ওপর আসন্ন, সেটা প্রতিহত করো। এর পন্থাহচ্ছে, তোমরা এই শিশুকে হত্যা করে ফেলো এবং এর সঙ্গে আমাকেও হত্যা করো! আর যদি তোমরা তাকে জীবিত ছেড়ে দাও তবে স্মরণ রেখো, সে তোমাদের দীন নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং এমন এক দীনের প্রতি তোমাদের দাওয়াত দেবে, যার কথা তোমরা কখনো শুনোনি!'

গণকের কথা শুনে হালিমা রা. ভয় পেয়ে যান এবং নবিজি (ﷺ) কে সেই হতভাগার হাত থেকে ছিনিয়ে এনে বলেন, 'তুই পাগল হয়ে গেছিস! আগে তোর নিজের মস্তিষ্কেরই চিকিৎসা করানো উচিত।'

এরপর হালিমা নবিজিকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন; কিন্তু এই দ্বিতীয় ঘটনাটি নবিজিকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে তাঁকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। কেননা, তাঁর ভয় হচ্ছিল, তিনি নবিজি (ﷺ) এর যথাযথ নিরাপত্তা দিতে পারছেন না।

আনাস রাদি আল্লাহু আনহু বলেন যে মুহাম্মদ ﷺ -এর বুক ফাড়া সেলাইয়ের দাগ তিনি দেখেছেন। [মুসলিম ১৬২]

[রাসুলে আরাবি ﷺ পৃ.৩০]

মায়ের কোলে প্রত্যাবর্তন

এই অতি অলৌকিক ঘটনার পর নবী ﷺ-কে তারা মক্কায় ফিরিয়ে দিয়ে যায়।
হালিমা যখন নবিজি (ﷺ) কে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে যান, আমিনা তখন প্রশ্ন করেন, 'এত আগ্রহের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পর এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসার কারণ কী?' অনেক পীড়াপীড়ির পর হালিমা পুরো ঘটনা বলেন। আমিনা সব শুনে বলেন, 'নিশ্চয় আমার ছেলের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।'
পরের দুই বছর সেখানে তিনি মায়ের আদর ভালোবাসা আর স্নেহে মমতায় বেড়ে উঠতে থাকেন।
[রাসুলে আরাবি ﷺ পৃ ৩০]

মায়ের সাথে ইয়াসরিব সফর

মক্কায় ফিরে আসার পর নবীজির বয়স যখন ৬ বছর হয় তখন মা আমিনা তাকে নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্য রওনা দেন ,স্বামীর কবর জিয়ারত হবে আবার ছেলেকে নানীর আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে। নবীজি ﷺ বাবার কবর সেখানেই । তার হাবশি বাঁদি বারাকা (উম্মে আইমান)- ও তাদের সবার সঙ্গে ছিলেন। আমিনা নানা বাড়ি বনু নাজ্জারে

কিছুদিন বেড়ান এখানে বনু আদি বিন নাজ্জারের একটি পুকুর ছিল ।নবীজি ﷺ সেখানে সাঁতার শেখেন। [সিরাতুন নবী]

মা আমিনার ওফাত এবং আব্দুল মুত্তালিব এর তত্ত্বাবধান

মদিনায় একমাস কাটানোর পর মক্কা অভিমুখে ফেরত পথে যাত্রা শুরু হয়। ইয়াসরিব থেকে ফেরার পথে মা আমিনা 'আবওয়া' নামক স্থানে আসার পথে হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এই স্থানে তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। শিশু মুহাম্মদ মা'কে হারিয়ে এখন ইয়াতিম । অসহায়।বাবা মা দুজনেরই ছায়াশূন্য। আমিনাকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়। এই অনাবাদ বিরান ভূমিটি মক্কা ও ইয়াসরিবের ঠিক মধ্যেখানে অবস্থিত ছিল।চারপাশ পাহাড় - বেষ্টিত একটি টিলাতে তাকে দাফন করা হয়। আব্দুল্লাহর এতিম ছেলেটি ছয় বছর বয়সে মায়ের মততা থেকে বঞ্চিত হয়। এমন দুর্দশা অবস্থায় তার পাশে এমন কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিল না যে তার মাথায় হাত বুলিয়ে এবং বুকে জড়িয়ে একটু সান্তনা দিবে ।আল্লাহ তরফ থেকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষেরা তরবিয়তের এমন কিছু ধাপ অতিক্রম করে,যা বালুকে প্রক্রিয়াজাত করার পর সোনার অলংকারে পরিণত করে। নবীজি ﷺ এর বাঁদী বারাকাহ (উম্মে আয়মান তার বয়স তখন ষোলো -সতেরো বছরের বেশি ছিল না)। অনেক কষ্ট করে তাকে মক্কায় নিয়ে আসেন। আব্দুল মুত্তালিব এই অনন্য এতিম নাতিকে আদর স্নেহের চাদরে আবৃত করে নেন ।তিনি এক মুহূর্তের জন্য তাকে দৃষ্টির আড়াল হতে দেন নি ।কাবার ছায়ায় যখন তার জন্য সর্দার হিসেবে কোন চাদর বিছিয়ে দেওয়া হতো ,যার উপর অন্য কারো বসার অনুমতি ছিল না ,তখনও তার দৌহিত্রকে তার সঙ্গে বসিয়ে নিতেন। তার পিঠ চাপড়ে দিতেন ,প্রতিমুহূর্তে খেয়াল রাখতেন। মুহাম্মদ ﷺ-এর উঠা বসা,চাল- চলন - আচরণ প্রতিটি বিষয়ই তাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করতো এবং আনন্দ দিতো।

তিনি একরকম নিশ্চিত ছিলেন যে ভবিষ্যতে তার নাতি অনেক বড় হবে। সবার মাঝে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে।

আব্দুল মোত্তালিব কখনো এই এতিম শিশুকে ছেড়ে কোথাও যাননি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সীমাহীন মায়া-মমতার সময়টা প্রভাত-সমীকরণের ন্যায় কেটে যায় । একদিন আব্দুল মুত্তালিব ও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।নবীজির বয়স যখন মাত্র আট বছর দুই মাস দশ দিন তখন আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করেন।

তাকে পুনরায় পিতা মারা যাওয়ার স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। এটা আগের তুলনায় ছিল অনেক বেশি তিক্ত ও কঠিন। তিনি তার পিতাকে কখনো দেখেননি। পিতার স্নেহ ভালোবাসার স্বাদ ও তিনি পাননি। এজন্য পিতার বিয়োগব্যথা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না, কিন্তু দাদার স্নেহ- যত্ন ও আদর-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবার বেদনা তিনি অনুভব করেছিলেন এবং সে বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা হয়েছিল।আর এই দুই মধ্যকার পার্থক্য সকলেই বুঝতে পারেন।

দাদা ইন্তেকালের পূর্বে ছেলে আবু তালিবকে নবীজির দিকভালো তত্ত্বাবধান করার ওসিয়ত করে যান।
(সিরাতুন নবী ﷺ পৃ.১১৬-১১৮)

সুন্দর শৈশব

সাধারণত বাল্যকাল উচ্ছৃঙ্খলতায় আর দুষ্টুমিতে ভরপুর থাকে। কিন্তু নবী করীম ﷺ প্রথম দিকেই নেহায়েত শিষ্ট , সম্ভ্রান্ত ,গম্ভীর এবং লাজুক ছিলেন। নবীজি ﷺ আরবদের মন্দচরিত্রে বিন্দু পরিমাণ প্রভাবিত হননি। শিরকি কার্যকলাপ ,শরাবপান ,গানবাদ্য থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিলেন। সততা ,আমানতদারি ,সহমর্মিতা, বিনয় ,মানবিকতা ,দয়া-মায়ার গুণে পরিপূর্ণ ছিলেন তিনি ।তার পাশাপাশি তিনি মেধাবী ,সামাজিক, সাহসী ও সচেতন ছিলেন।
(সিরাতুন নবী ﷺ পৃ.১১৯)

চাচার মমতায় প্রতিপালন

আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তার ছেলে আবু তালিব দ্বায়িত্ব নেন মুহামমাদ ﷺ এর প্রতিপালনের। তিনি নবীজির আপন চাচা। তিনিও নবীজিকে অনেক আদর ও স্নেহ করতেন । আবু তালিব ধনী ও সচ্ছল ছিলেন না ।কিন্তু রাসূল ﷺ-এর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তার অল্প সম্পদেও এমন বরকত হতে আরম্ভ করে যে একজনের খাবারই পুরো পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। আর নবীজি ﷺ নিজেও ধৈর্য অল্পতুষ্টির ক্ষেত্রে আদর্শ ছিলেন, যা জুটত তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি একাগ্রচিত্তে তাঁর দিকে মনোযোগ দেন এবং আপন সন্তান আলী,জাফর ও আকিল রাযিআল্লাহু আনহু এর চেয়েও বেশি কোমল ,স্নেহপরায়ণ, যত্ন-তদবীরে রাসুল ﷺ-কে সাথে রাখেন।

চাচা আবু তালিব এর সঙ্গে সিরিয়া সফর ও পাদ্রির সঙ্গে সাক্ষাৎ

একবার আবু তালিব বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে একটি কাফেলার সঙ্গী হয়ে সিরিয়া যাচ্ছিলেন এ সময় রাসূল ﷺ-এর বয়স ছিল **১২** বছর।তিনি চাচাকে রওনা হতে দেখেই জড়িয়ে ধরেন। আবু তালিব এতে খুব অভিহিত হয়ে পড়ে এবং ভাতিজাকে সফর সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন।

এই বাণিজ্য কাফেলা বুসরা নামক স্থানে পৌঁছালো এবং সেখানে ছাউনি ফেলল। এটি ছিল সিরীয় এলাকা ।এখানে বুহায়রা নামক একজন পাদরির সাধনা গৃহ ছিল।বাহিরা বা বুহায়রা তার সাধনা গৃহ থেকে সাধারণত বের হতেন না। কিন্তু সেদিন বের হন এবং কাফেলার লোকদের পরখ করতে করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছে যান । তার হাত ধরে বলতে লাগলেন ,‘এ পৃথিবীর সরদার ,এ বিশ্ব প্রতিপালকের রাসুল ,এ বিশ্ব মানবতার প্রতি দয়া’।

কুরাইশের কিছু বৃদ্ধ বলল তুমি তা কিভাবে জানলে?

বললেন, তোমরা যখন উপর থেকে নিচে নামছিলে, তখন আমি দেখলাম এখানকার প্রতিটি বৃক্ষ কিংবা পাথর তার সম্মানে অবনত হচ্ছে। এমন শুধু নবীদের জন্যই করা হয়ে থাকে। তার দুই কাঁধের মাঝে মোহরে নবুওয়াত থাকার কারনে তাকে নবী হিসেবে চিনতে পেরেছি ।

সাধু বুহায়রা কাফেলাকে দাওয়াত করেন, উষ্ণ আন্তরিকতা-সহকারে সকলকে অভ্যর্থনা জানান।ভুরিভোজে আপ্যায়িত করেন এবং আবু তালেব থেকে এই মর্মে শপথ নিলেন ,যে এই বালককে নিয়ে শামে যাবেন না। কারণ সেখানকার রোমানরা যদি তার এই নবুয়তের গুণাবলি জানতে পারে তাহলে তারা তাকে মেরে ফেলবে । আপনি আপনার ভাতিজাকে নিয়ে ঘরে ফিরে যান এবং ইয়াহুদীদের হাত থেকে তাকে বিশেষভাবে হেফাজত করেন কেননা আপনার ভাতিজা ভবিষ্যতে বিরাট মর্যাদার অধিকারী হবেন। এরপর আবু তালিব রাসুল ﷺ -কে একজন লোক দিয়ে মক্কা পাঠিয়ে দেন।

নবীজি ﷺ মক্কায় ফিরে আসেন।

(নবীয়ে রহমত ﷺ পৃ.১২৪-১২৫)

তৃতীয় অধ্যায়: নুবুওয়াতের পূর্ব জীবন

আসমানী প্রশিক্ষণ

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর লালন পালন বিশেষ নিরাপদ ও কালিমা মুক্ত পরিবেশে হয় এবং জাহেলিয়াতের নাপাক ও খারাপ অভ্যাস সমূহ থেকে আল্লাহতালা তাকে সর্বদাই দূরে ও মুক্ত রাখেন। যাকে তার জাতি গোষ্ঠী প্রথম থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয় গুণাবলী ও উন্নত মনোবলের অধিকারী, উত্তম চরিত্রে বিভুষিত , ভদ্র ,নম্র ,সত্যবাদী ,আমানতদার । কুকর্ম - অশ্লীল আচরণ থেকে দূরে বলে মনে করত। এমনকি তার জাতিরা তাকে আলআমিন বলে ডাকতো।

আল্লাহ তাআলা তাকে ঐ সব বিষয়ে ও জাহেলিয়াতের সমস্ত আচার অভ্যাস থেকে মুক্ত ও নিরাপদে রেখেছিলেন যে সব তার শাণ ও মর্যাদার উপযোগী ছিল না। যদিও সেই সমাজে সেসবের মধ্যে কোন খারাপের কিছু বলে আছে মনে করা হতো না তেমনি এসব বিষয়ের উপর কারো দৃষ্টি ও করত না, তিনি আত্মীয়তার দিকে খেয়াল রাখেন ,লোকের দুর্বহ বোঝা হালকা করতেন এবং তাদের প্রয়োজন মেটাতেন। তিনি মেহমানের মেহমানদারী করতেন, কল্যাণমূলক ও তাকওয়া ভিত্তিক কাজেকর্মে অন্যদের সাহায্য করতেন। পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করতেন এবং মামুলি ও যতটুকু না হলেই নয় ততটুকু খাদ্যকেই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন।

(নবিয়ে রহমত ﷺ পৃ:১২৬)

‘বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর মুহাম্মাদ ﷺ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ নেন এর মাঝে দুটি ঘটনা আলাদা মনোযোগের দাবিদার।’

১)হারবুল ফিজারে অংশগ্রহণ
২)হিলফুল ফুদূল গঠন

হারবুল ফিজারে অংশগ্রহণ

মুহাম্মদ ﷺ-এর এর বয়স তখন ২০ বছর। তখন থেকেই মক্কার বিভিন্ন এলাকায় অনবরত যুদ্ধ চলতে থাকে একে ‘হুরুবুল ফিজার’ বা ফিজার যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে। এই যুদ্ধ প্রথম

সংঘটিত হয় বনু কিনানা এবং হাওয়াজিনের মাঝে ।দ্বিতীয় বার কুরাইশ হওয়াজিনের মধ্যে , তৃতীয়বার হাওয়াজিন ও বনু নাসর বিন মুয়াবিয়ার মুখোমুখি যুদ্ধ । চতুর্থ লড়াই হয় আগের চেয়ে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী । এ লড়াই ফিজারে রাবে এবং ফিজারে বাররায নামে প্রসিদ্ধ।

যুল-কাদা মাসে যথারীতি চলছে উকাজ মেলা কিন্তু সেখানে কোনো এক ঘটনার জের ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধে যায় ।এক পক্ষে রয়েছে কুরাইশ ও কিনানা গোত্রদ্বয় আরেক পক্ষে কায়স ও গায়লান।

যুদ্ধের দিন কুরাইশের বিচক্ষণ পুরুষেরা সারিবদ্ধ হয়ে ময়দানে দাঁড়ায় ।বালকদেরকেও সাহায্যের জন্য জন্য তলব করা হয় ।নবী করীম ﷺ -ও চাচাদের সাথে ছিলেন। তাদেরকে তিরন্দাজির দায়িত্ব দেওয়া হয় ।এই যুদ্ধে ছিলেন বনু হাশিমের সর্দার জুবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালিবও

উপস্থিত । কুরাইশের নেতৃত্ব দিচ্ছিছিলেন বনু উমাইয়ার সর্দার হারব বিন উমাইয়া ।যুদ্ধের শুরুতেই শত্রুপক্ষ কুরাইশের উপর পুরো চড়াও হয়ে পড়ে ।নবীজির চাচারা তীর নিক্ষেপ করেছিলেন আর তিনি দুশমনের তীর কুড়িয়ে জমা করে রাখছিলেন, যেন তীরের সংকট তৈরি না হয় । দিনের শুরুতে বনু কায়েসের যুদ্ধের পালা ভারী ছিল ।কিন্তু সূর্য ঢোলের পর থেকেই কুরাইশের যুদ্ধের রূপ পাল্টে যায় এবং বনু কায়েস পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করে। এটাই ছিল নবী করীম ﷺ - এর যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রথম অভিজ্ঞতা।

হিলফুল ফুজুল

ফিজার যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরে সেই মাসেই কুরাইশের পাঁচটি বংশের মাঝে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।এর নাম হিলফুল ফুজুল। স্বাক্ষরকারী পক্ষগুলো হলো বানূ হাশিম ,বানূ আব্দুল মুত্তালিব ,বানূ আসাদ,বানূ যাহরা এবং বানূ তাইম।

এই চুক্তির মূল কথা ছিল কুরাইশরা ইতিপূর্বে অহেতুক রক্তপাতে লিপ্ত হতো। তারা ন্যায়সঙ্গত সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করতে চাচ্ছিলেন। তাছাড়া এর তাৎক্ষণিক একটি কারণ ছিল ।

চুক্তিটির আবির্ভাব হয় এক লজ্জাকর ঘটনার প্রতিবাদে।স্রেফ অপরিচিত আর অচেনা হওয়ার অপরাধে এক ব্যক্তিকে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করার ঘটনা।

জুবায়েদ (ইয়েমেন) অঞ্চল থেকে এক ব্যক্তি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন ।আস ইবনু ওয়াইল নামক স্থানীয় এক ব্যক্তি তার সকল পণ্য বিনামূল্যে ছিনিয়ে নেয়। অসহায় লোকটি একে একে

বানূ আবদিদ দার ,বানূ মাখযূম , বানূ জামাহ্ ,বানূ সাহম ও বানূ আদির কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। একটা মানুষও তার সেই আকুল আবেদনে সাড়া দেয়নি।মরিয়া হয়ে লোকটি জাবালে আবী কুবাইস-এর চূড়ায় উঠে দাঁড়ান। সবার কাছে ঘোষণা করেন নিজের দুঃখের কাহিনী ।শ্রোতাদের কাছে সাহায্যের চেয়ে আকুল আবেদন ব্যক্ত করেন ।সে আবেদনের সাড়া দেন জুবায়ের ইবনু আব্দুল মোত্তালিব। দুর্দশা গ্রস্থ অচেনা লোকটির দিকে বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত।

নবীজীর ﷺ এর চাচা জুবাইর সকল গোত্রের প্রতিনিধিদের এক জায়গায় জড়ো হওয়ার আহ্বান করেন। বানূ তাইমের সরদার আব্দুল ইবনু জুদআনের বাড়িতে সভা বসে। সেখানে গোত্রপতিরা এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে ঐক্যমত পোষণ করেন। তখন তাদের মাঝে চুক্তি হয় তারা জালেমের মোকাবেলায় এবং মজলুমের সাহায্যে প্রত্যেকেই পরস্পরের সহযোগী হবে। বংশ-গোত্র নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায় অত্যাচার প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর আস ইবনু ওয়াইলকে বাধ্য করা হয় ওই ব্যক্তির পণ্যদ্রব্য ফিরিয়ে দিতে।

জিলকদ মাসে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত শান্তি চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী প্রসিদ্ধ তিন ব্যক্তির নাম ছিল ফজল,ফাজালা এবং মুফাজ্জল ; এর জন্য তার নাম দেওয়া হয় ‘হিলফুল ফুজুল’।

চুক্তির সময় মোহাম্মদ ﷺ -ও সে সভায় নিজ চাচাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। তাদের এই ইনসাফপূর্ণ কথা ও স্বীকারোক্তিতে তিনি অনেক খুশি হন।

নুবুওয়াত লাভের পর নবীজি বলেছিলেন, “ আব্দুল্লাহ ইবনু জুদাআনের ঘরে সেই চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনায় আমিও অংশগ্রহণ করেছিলাম ।এমন এক চুক্তি , যার বিনিময়ে লাল উটও

আমার অপছন্দ। ইসলামের যুগেও যদি সে চুক্তির জন্য আমাকে ডাকা হতো ,তাহলে অবশ্যই আমি তাতে সাড়া দিতাম।”

(রাসুলে আরাবি ﷺ পৃ.-৩৩)

হালাল উপার্জনের জন্য পরিশ্রম

মুহাম্মদ ﷺ ইয়াতীম হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রথমে আপন দাদা পরে চাচার অধীনে লালিত পালিত হয়েছেন। পিতার নিকট থেকে উত্তারাধিকার সূত্রে অল্প কিছু সম্পদ পেয়েছিলেন যা দিয়ে দিয়ে তেমন কিছুই করার উপযোগী ছিল না। এই কারণে তিনি যখন হালকা পাতলা কাজ করার উপযুক্ত হন তখন থেকে দুধ ভাইয়ের সাথে বানূ সা'দের ছাগল চড়াতেন।

মক্কায় ফিরে আসার পরও মাত্র কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কা বাসীর ছাগলের রাখালি করতেন।

সেই যুগে এটা জীবিকার একটি অভিজাত উপায় ছিল। সেই সাথে মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ, দুর্বল ও অভাবী লোকদের উপর স্নেহ ও ভালোবাসার প্রেরণা সৃষ্টি। তদপুরি সচ্ছ ও নির্মল বায়ুর আমেজ লাভ এবং শরীরের শক্তি ও ব্যায়ামের উপকরণও এর ভিতর পাওয়া যায়। এর থেকেও বেশি যা তাহলে এটা আম্বিয়া কেরামের সুন্নত । এই রাখালগিরির কিন্তু জেনো তেনো কাজ নয় , নুবুওয়াত জীবনে এই পেশার রয়েছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ।নবুওয়াত লাভের পর মোহাম্মদ ﷺ একবার বলেছেন

وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا رَعَاهَا

“প্রত্যেক নবী বকরী বা ভেড়া চড়িয়েছেন ” (বুখারী ৫৪৫৩)

‘এমন কোন নবী গত হননি যিনি বকরি না চরিয়েছেন ।’ জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও !’বলেন, আমিও।’

যৌবনে পদার্পণের পর নবী করিম ﷺ নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে জীবিকার খোঁজে বের হওয়ার চিন্তা করেন। তিনি নিজেকে ব্যবসায়িক কাজে নিযুক্ত করেন । বনু হাশিমের পেশা ছিল ব্যবসা - বাণিজ্য করা ; কিন্তু নবীজি ﷺ -এর কাছে কোনো পুঁজি ছিল না। তাই তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের ব্যবসায় শ্রম দিতো । কিছু কিছু বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে , রাসুল ﷺ সাইব ইবনু আবী সাইবের সাথে মিলে ব্যবসা করতেন। নবীজি ছিলেন সর্বোত্তম পার্টনার। অহেতুক বাদানুবাদ কিংবা ঝগড়া করতেন না সমস্ত কাজে বিশ্বস্ততা ও সততা ছিল,তার আমরণ সঙ্গী এ কারণেই সবার মুখে তিনি “আল আমিন” (অতি বিশ্বস্ত) বলে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে যান।

এরপর নবীজি ﷺ -এর চাচা জুবায়েরের সাথে ব্যবসা- বাণিজ্য করেন এবং তার সাথে ইয়েমেনে সফরও করেন।

ঈর্ষণীয় তারুণ্য ,ব্যবসা ও বিয়ে

নিজের পুঁজি না থাকায় অন্যের পুঁজি বিনিয়োগ করে লভ্যাংশের ভিত্তিতে ব্যবসা করতে থাকেন নবী ﷺ। তার বয়স যখন ২৫ তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে ধনদৌলত দিয়ে সম্পদশালী বানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ নামের কুরাইশের একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত নারী ছিলেন । যাঁর ছিল প্রচুর ধনসম্পদ। পাশাপাশি তিনি ধীমান আর বুদ্ধিমতি হিসেবেও ছিলেন প্রসিদ্ধ। তখনকার মক্কার দরিদ্র পুরুষদের মধ্যে যারা মেধাবী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও বিশ্বাসী হিসেবে খাদিজার জানাশোনা ছিল,তিনি নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ লোকদেরকে নিজের পুঁজি দিয়ে ব্যবসায় নিয়োগ দিতেন। তাদের হাতে তিনি অর্থ-সম্পদ দিয়ে বলতেন, 'এগুলো অমুক জায়গায় গিয়ে বিক্রি করবে এবং এর লভ্যাংশ থেকে তোমাকে এ পরিমাণ দেওয়া হবে।’

যদিও রাসূল ﷺ তখনো নবুওয়াত পাননি, তবে তাঁর আমানতদারিতা, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার কথা সর্বমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সবাই তাঁর উত্তম চরিত্র ও উন্নত গুণাবলির যথেষ্ট মূল্যায়ন করত। মক্কার মানবসমাজে তাঁর সততা ছিল প্রবাদতুল্য। ফলে 'আল আমিন' বা 'বিশ্বাসী' উপাধিতে তিনি ভূষিত হন। তাঁর এই খ্যাতি ও উন্নত মর্যাদার কথা ধীমান

খাদিজা (রা.) এর অজানা ছিল না। খাদিজা (রা.) নবীজির আভিজাত্য, দ্বীনদারী এবং আরো গুণাবলীর প্রতি মুগ্ধ হন। তিনি চাচ্ছিলেন, নবিজি ﷺ এর হাতে সম্পদ দিয়ে তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার মাধ্যমে ব্যবসায় অধিক মুনাফা অর্জন করবেন। এ আশায় তিনি রাসূল ﷺ এর কাছে লোক পাঠিয়ে বলেন, 'আপনি যদি আমার ব্যবসাপণ্য নিয়ে শামে যান,তাহলে আমার এক দাসকে আপনার খিদমতের জন্য সঙ্গে দেবো এবং ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে অন্যদের যে পরিমাণ দিই, আপনাকে এরচেয়ে বেশি দেবো।'

রাসূল ﷺ যেহেতু উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, উচ্চ সাহস আর দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন, তাই খাদিজা (রা.) এর এমন প্রস্তাব পেয়ে সাড়া দিতে দেরি করেননি।

তিনি সফরের জন্য তখনই প্রস্তুত হয়ে যান এবং খাদিজা (রা.) এর দাস মায়সারাকে সঙ্গে নিয়ে ১৬ জিলহজ শামের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। শামে পৌঁছে তিনি খাদিজা (রা.) এর দেওয়া পণ্যসামগ্রী অধিক লাভে বিক্রি করতে সমর্থ হন। এরপর সেই অর্থ দিয়ে আরও কিছু পণ্য কিনে মক্কায় ফিরে সেগুলো খাদিজা (রা.) এর হাতে তুলে দেন। শাম থেকে নিয়ে আসা সেসব পণ্য মক্কায় বিক্রি করে খাদিজাও দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করেন।

শামে যাওয়ার পথে রাসূল ﷺ এক জায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সেখানে 'নাসতুরা' নামের এক ই*য়া/হুদি পন্ডিত ও সন্ন্যাসী তাঁকে দেখতে পান। পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থগুলোতে শেষ নবি সম্পর্কে যেসব নিদর্শন বিবৃত হয়েছে, তাঁর মধ্যে সেসব দেখে সেই ই*য়া/হুদি যাজক নবিজি ﷺ কে চিনে ফেলেন। তা ছাড়া তিনি আগে থেকেই খাদিজা (রা.) এর দাস মায়সারাকে চিনতেন। ফলে তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার সঙ্গের লোকটি কে?' মায়সারা জবাবে বলেন, 'তিনি মক্কার কুরাইশের সম্ভ্রান্ত এক যুবক।' ই*য়া/হুদি পণ্ডিত তখন বলেন, 'এই যুবক ভবিষ্যতে নবি হবে।'

(সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া ﷺ পৃ.২৭)

খাদিজা (রা.) সঙ্গে রাসূল (ﷺ) এর বিয়ে ও বৈবাহিক জীবন

ইতিমধ্যে খাদিজার দুজন স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে। বর্তমানে তিনি স্বামীহীন বিধবা। প্রথম স্বামীর নাম আতিক ইবনু আয়িস মাখযুমি। তার মৃত্যুর পর বিবাহ করেন আবু হালা তাইমিকে। আবু হালার ঘরে তার একমাত্র সন্তানেরও জন্ম হয়। দ্বিতীয় স্বামী আবু হালাও

মৃত্যুবরণ করেন। এরপর কোরাইশের একাধিক প্রভাবশালী নেতার কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব পেয়েছিলেন তিনি ।কিন্তু তিনি সবগুলোই ফিরিয়ে দেন।

এবার মাইসারার কাছে মোহাম্মদ ﷺ -এর সততা বিশ্বস্ততা দক্ষতা ও সুউচ্চ চরিত্রের বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান খাদিজা। তারপর যখন শুনলেন সূর্যের তাপ থেকে বাঁচাতে দুজন ফেরেশতা তাকে ছায়া দান করছিল তখন তিনি এতই মুগ্ধ হন যে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। খাদিজা অনুভব করলেন জীবনসঙ্গী তিনি পেয়ে গেছেন। পরে বান্ধবী নাফিসার মাধ্যমে মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে বিবাহের প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন।

মুহাম্মদ ﷺ এ ব্যাপারে তার চাচাদের সাথে পরামর্শ করেন। তারা খাদিজার চাচা আমর ইবনু আসাদের কাছে মোহাম্মদ ﷺ -এর পক্ষ থেকে খাদিজার জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। ভাতিজির পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করেন আমর।

দেনমোহর হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ বিশটি উট প্রদান করেন(অন্য বর্ণনায় ছয়টি উটের কথা আছে)। বানু হাশিম ও কুরাইশ গোত্রপতিদের উপস্থিতিতে শুভ কাজটি সুসম্পন্ন হয়।

আল্লাহতালার প্রশংসা ও স্তুতি এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর মর্যাদা ও গুণাবলী সহকারে খুতবা পাঠ করেন আবু তালিব। সে খুতবায় তিনি নবীজি ﷺ সম্পর্কে যেসব কথা বলেন সেগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আবু তালিব বলেন

“এ হচ্ছে আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ। সহায়-সম্পদ কম থাকলেও সে উন্নত স্বভাব-চরিত্র এবং অনন্য গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ফলে সমাজের আর দশজনের চেয়ে সে এতটাই উপরে অবস্থান করছে যে, যদি কাউকে তাঁর বিপরীত দাঁড় করানো হয়, তাহলে সে তার থেকে অনেক উচ্চমর্যাদার অধিকারী প্রমাণিত হবে। কেননা, অর্থসম্পদ হচ্ছে ছায়ার মতো এবং প্রত্যাবর্তনশীল বস্তু; আর এই মুহাম্মাদ-যাঁর বংশমর্যাদা ও আত্মীয়তা সম্পর্কে আপনারা সবাই অবগত-সে খুওয়াইলিদের মেয়ে খাদিজাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। তাঁর বিয়ের মোহর থেকে নগদ যা দেবে এবং যা পরে পরিশোধযোগ্য, এর সব আমি প্রদান করব এবং এই দায়িত্ব আমি নিলাম। আল্লাহর কসম, ভবিষ্যতে সে বিপুল সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে।”

উপর্যুক্ত খুতবায় আবু তালিব রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেননা, রাসূল (ﷺ) এর বয়স তখন মাত্র ২৫ বছর। এ বয়সেই তিনি চাচার কাছ থেকে তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্বীকৃতি লাভ করেন। এ ছাড়া তখনো তাঁর কাঁধে নবুওয়াতের গুরুভার অর্পিত হয়নি। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, আবু তালিব তখনো সেই পুরানো ধর্মমত ও বাপ-দাদার রীতি-বিশ্বাসে অটল ছিলেন, যে ধর্মমত ও রীতি নির্মূল করতে রাসূল (ﷺ) তাঁর সারাটি জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, সত্য কখনো গোপন রাখা যায় না, কোনো না কোনো ভাবে একসময় তা প্রকাশ হবেই।

মোটকথা, খাদিজা রা. এর সঙ্গে রাসূল (ﷺ) এর বরকতময় বিয়ে সম্পন্ন হয়।

সিরিয়া থেকে ফেরত আসার দুই মাস কয়েক দিনের মাথায় ২৫ বছর বয়সী মুহাম্মদের বিবাহ সম্পন্ন হয় ।কনের বয়স ছিল ৪০ ।কোন কোন বর্ণনায় আটাশের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

বৈবাহিক জীবন

নবী করিম ﷺ নিঃস্ব ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বৈবাহিক জীবনের সাথে সাথে আর্থিক সচ্ছলতা দিয়েছিলেন। ওদিকে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এমন জীবন সঙ্গী লাভ করেছিলেন ,যে তিনি যতই এ নিয়ে গর্ব করতেন, মনে হতো তাঁর হক আদায় হচ্ছে না। তিনি নিজের ধনসম্পদ ,জায়গা-সম্পত্তি এবং ব্যবসায়ীক পুঁজি সবই নবীজীর খেদমতে সপে দেন। নবীজির সন্তুষ্টি ছিল তার সন্তুষ্টি।

নবী করিম ﷺ স্ত্রীর ঘরেই বসবাস করতে থাকেন। সে ঘরে দুটি বেডরুম এবং মেহমানখানা ছিল। এই বরকতময় ঘরেই নবীজি ﷺ যৌবনের ২৮ টি বছর কাটিয়েছেন। বরকতময় দাম্পত্যজীবনের দীর্ঘ এ সময়ে রাসূল (ﷺ) অন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করেননি।

নবীজির খেদমতে তখনো সেই হাবসি বাঁদি বারাকাহ নিয়োজিত ছিলেন। নবী করিম ﷺ বলতেন, “আমার মায়ের পর তিনিই আমার মা ছিলেন”

উম্মে আইমান নবীজী থেকে ১০ -১১ বছর বড় হবেন। তিনি নিজের বিয়ের সময় বাঁদির পড়ন্ত বয়স এবং পূর্বের অবদানের কথা চিন্তা করে কেবল তাকে আজাদই করে দেননি, বরং একজন অমায়িক মানুষ হারিস বিন জায়েদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। ফলে তিনিও নিজ স্বামীর ঘরে স্থির হয়ে যান তার একটি ছেলে হয় ,যার নাম রাখেন আইমান।তখন থেকে ই ছেলের নামের দিকে সম্বন্ধ করে তাকে বারাকার পরিবর্তে উম্মে আইমান বলে ডাকা হয়।

হযরত যায়েদ বিন হারিসার দায়িত্ব গ্রহণ

নবীজি ﷺ -এর ঘরে স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়াও আর একজন ছিল কালবের হারিয়ে যাওয়া ছেলে জায়েদ বিন হারিসা। দুশমনরা তার গোত্রের উপর হামলা করে তাকে ছিনতাই করে উকাজ বাজারে নিয়ে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে দেয়। তার বয়স ছিল তখন মাত্র আট বছর।হযরত খাদিজা (রাঃ) -এর ভাতিজা তাকে খরিদ করে চাচীকে দিয়ে দেন। নবীজির সঙ্গে যখন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে হয় তখন তিনি যায়েদকে তার খেদমতের জন্য প্রদান করেন ।

একসময় জায়েদের পিতা হারিসা জানতে পারেন যে তার হারানো সন্তান কুরাইশ গোত্রে গোলাম হিসেবে আছে। তিনি সোজা মক্কায় উপস্থিত হন । নবীজি ﷺ -এর নিকট অনুনয়-বিনয় করে তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন এবং তার মুক্তিপণও পেশ করেন। নবী করিম ﷺ বললেন, 'যায়েদকে জিজ্ঞাস করুন। যদি সে যেতে চায় তাহলে কোন মুক্তিপণ ছাড়াই আপনি নিয়ে যান। আর যদি না যেতে চায় ,তা হলে জোর করে তাকে পাঠাবো না।'

যায়েদকে ডাকা হলো। তখন তিনি পিতার সাথে যেতে অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, 'আমি নবীজিকে ছাড়া কারো সঙ্গে থাকা পছন্দ করি না ।'

পিতা হতভম্ব হয়ে বললেন, বেটা , মুক্ত জীবনের তুলনায় তুমি গোলামির জিন্দেগি বেছে নিচ্ছো?

যায়েদ বললেন,জি বাবা !আমি নবীজির মাঝে যে উত্তম গুণাবলী প্রত্যক্ষ করেছি, এগুলো ছাড়া আমার অন্য কিছু পছন্দ নয়।'

নবী করীম ﷺ তার প্রতি যায়েদের মহব্বত দেখে খুব মুগ্ধ হন আর তখনই মসজিদে হারামে গিয়ে ঘোষণা দেন যে, 'আমি একে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলাম।'

যায়েদের পিতা এই দৃশ্য দেখে আশ্বস্ত হন এবং নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যান। হযরত যায়েদ রাদিআল্লাহু আনহু প্রথম থেকেই নবীজি ﷺ -এর সাথে সাথে থাকতেন; কিন্তু এ ঘোষণার পর থেকে তার এত ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন যে , লোকেরা তাকে 'যায়েদ বিন মুহাম্মদ' বলে ডাকতে থাকে।

(সিরাতুন নবী ﷺ পৃ.১২৬)

নবীজির পারিবারিক জীবন

বিয়ের পর থেকে 40 বছর পর্যন্ত সময়টা ছিল নবীজির জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদিও সিরাতের কিতাব সমূহে খুব সংক্ষিপ্তভাবে তার আলোচনা এসেছে।

এই ১৫ বছর নবীজি,তারুণ্যদীপ্ত কর্মযজ্ঞ,সমাজকল্যাণ এবং পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়ে একটি ব্যস্ততম সময় পার করেছেন। যেহেতু তার জীবিকার মাধ্যম ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য; তাই লেনদেন কার্যক্রমের জন্য তাকে দিনভর বিভিন্ন এলাকার মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হতো।

ব্যবসায়ী জীবন এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারে তার সুনাম-সুখ্যাতি তুঙ্গে ছিল। পুরা মক্কাতে তার চেয়ে সম্ভ্রান্ত, বুদ্ধিমান ,সম্মানিত, উত্তম চরিত্রবান কেউ ছিল না। সকলেই তার সততা,দ্বীনদারীর কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করত। নিজেদের মূল্যবান জিনিসপত্র আমানত রাখার জন্য নবীজিকেই তারা বিশ্বস্ত মনে করত। সবাই তাকে 'সাদিক' এবং 'আল আমিন' বলে ডাকত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যবাদিতা এবং ওয়াদা রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। মক্কার অধিবাসী আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হামসা নামক এক ব্যক্তির সাথে নবীজির কিছু লেনদেন হয়। তখন আব্দুল্লাহর কাছে ঋণ পাওনা হন। সে বলে ,'আপনার পাওনা আমি এখানে এনে

পরিষদ করে দিচ্ছি'- বলে সে তার বাড়ি চলে যায়। সে তার ওয়াদা পূরণের কথা ভুলে যায়।তৃতীয় দিন তার স্মরণ হতে সেই জায়গায় গিয়ে দেখে নবীজি সেখানেই তার জন্য অপেক্ষা করছেন। নবীজি ﷺ তাকে কেবল এইটুকু বললেন তুমি আমাকে ক্লান্ত করে ফেললে।

নবীজি ﷺ যৌথ ব্যবসাও করেছেন। দুজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার ব্যবসায়ে পার্টনার ছিল। তারাও নবীজির দ্বীনদারী এবং সুন্দর লেনদেনের স্বীকারোক্তি দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পণ্য নিয়ে মক্কার বাইরেও যেতেন। মক্কার উত্তর -পূর্বে তায়েফের নিকটবর্তী 'উকাজ' বাজার । এখানে ব্যবসা ছাড়াও কবিতা আবৃত্তি এবং গল্পের আসর জমে উঠত। বিভিন্ন গোত্রের ঝগড়াঝাঁটির ফায়সালা এখানে হতো। নবীজি ﷺ পণ্য নিয়েই বাজারেও গমন করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বকর বিন আবু কুহাফা স্বভাব-প্রকৃতি, ধ্যান ধারণা, অভ্যাস- সবগুণেই নবীজির সঙ্গে তার মিল ছিল। পাশাপাশি উভয়ে একই পেশার লোক ছিলেন। মূর্তিপূজা, মদপানসহ অন্যান্য মন্দস্বভাব তিনি একদম পরিহার করে চলতেন।

ঐ পনেরো বছরের দিনলিপির এর সে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না ।কিন্তু এটুকু বোঝা যায় যে ,পুরো দিন তার ব্যবসা-বাণিজ্য ,সামাজিক ও পারিবারিক কাজে কেটে যেত ।আর একাকীত্বে তিনি আল্লাহ তায়ালার কুদরত, দুনিয়ার সূচনা ,ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করতেন।

(সিরাতুন নবী ﷺ পৃ.১২৭)

খাদিজা (রা.) এর গর্ভে রাসূল (ﷺ) এর সন্তানাদি

খাদিজা (রা.) মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রথম স্ত্রী। তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় নবী ﷺ আর কোন বিবাহ করেননি।
রাসূল (ﷺ) এর সকল সন্তানই খাদিজা (রা.) এর গর্ভজাত। তবে ইবরাহিম নামে তাঁর তৃতীয় একজন ছেলে ছিলেন, যিনি মারিয়া কিবতিয়া (রা.) -এর গর্ভে জন্মান।

খাদিজা (রা.)-এর গর্ভে রাসূল (ﷺ) এর ছয়জন সন্তান জন্ম নেন। তন্মধ্যে দুজন ছেলে আর চারজন মেয়ে। ছেলে দুজনের নাম কাসিম ও তাহির। কাসিমের নামানুসারেই রাসূল (ﷺ) এর উপনাম ছিল 'আবুল কাসিম'। আর তাহির সম্পর্কে বলা হয়, তাঁর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ।

তাঁর তিন পুত্রসন্তানের সবাই শৈশবে ই/ন্তে*কাল করেন। তবে কাসিম সম্পর্কে কোনো কোনো বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি বাহনে চড়ার বয়সে উপনীত হয়েছিলেন।

মেয়ে চারজনের নাম : ১. ফাতিমা (রা.), ২. জায়নাব (রা.), ৩. রুকাইয়া (রা.) এবং ৪. উম্মু কুলসুম (রা.)।

তাঁদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন জায়নাব (রা.)।

বাইতুল্লাহ বিনির্মাণ ও কালো পাথর ঘিরে বিবাদ নিরসন

মুহাম্মদ ﷺ -এর বয়স যখন ৩৫, তখনকার ঘটনা। এক বিধ্বংসী বন্যায় কাবা প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর আগেও আরেক অগ্নিকাণ্ডে দেয়াল দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। বন্যা এলো গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে। ধর্মীয় মর্যাদাসম্পন্ন এক স্থাপনা একদম ধ্বসে পড়ার দ্বারপ্রান্তে ।একটু পরেই হয়তো হুরমুড় করে ভেঙে পড়বে।

কুরাইশরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল স্থাপনার সংস্কারের। জাহেলী যুগ হলে কি হবে? কিছু ব্যাপারে তখনো কুরাইশদের ধর্মীয় সততার চেতনা ছিল একদমই টনটনে। উক্ত সংস্কারকর্মকে তারা সব রকমের অবৈধ উপার্জনের টাকা থেকে পবিত্র রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

তবে সংস্কার করার আগে তো পুরো দেয়াল ভেঙে ফেলতে হবে। কুরাইশরা ভয় পেতে থাকে যে,পবিত্র ঘরটির সাথে এমন মন্দ আচরণ হতে দেখলে আল্লাহ পাকড়াও করবেন। অবশেষে ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা সাহস করে এগিয়ে আসেন। ঘোষণা দেন,“আল্লাহ সংস্কারদের ধ্বংস করবেন না।”এই বলে তিনি দেয়াল হওয়ার কাজ শুরু করেন। কোনও আসমানী শাস্তি আসছে না দেখে বাপেরাও আশ্বস্ত হয়ে কাজে হাত দেয়। ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)- এর নির্মাণ করা আদি ভিত্তি ছাড়া পুরো কাবা ভেঙে ফেলা হয়।

পুনঃনির্মাণ কাজে সব গোত্রকে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়।সম্ভ্রান্তরা পাথরের টুকরো বহন করে নিয়ে এক জায়গায় স্থির করতে থাকেন । মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর চাচা আব্বাসও এই কাজেই নিয়োজিত ছিলেন। পাহাড় থেকে পাথর বহন করে নিয়ে আসতেন।

বাকূম নামক জনৈক রোমান রাজমিস্ত্রি দেয়াল পুনঃনির্মাণের মূল কাজটি করেন ।কিন্তু পুরা কাজ সম্পন্ন করার মতো যথেষ্ট টাকা কুরাইশদের কাছে ছিল না। ফলে ইব্রাহিম(আলাইহিস সালাম)-এর ভিত্তি অনুযায়ী নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। তাই উত্তর দিকে ছয় হাতের মতো জায়গা ছেড়ে দিয়ে তার ওপর ছোট্ট করে একটি দেয়াল তুলে দেওয়া হয়। যাতে বোঝা যায় এটি ও কা’বার অংশ। এই অংশটিকে বলা হয় হাজর এবং হাতীম।

যে স্থানে কালো পাথর (হাজরে আসওয়াদ)স্থাপন করার কথা,ওই পর্যন্ত দেয়ালের নির্মাণ কাজ শেষ হলে দেখা দেয় এক বিরাট সমস্যা। প্রত্যেক গোত্রপতিই হাজারে আসাদ স্থাপনের বিরল সম্মান অর্জন করতে চায়। কেউ কাউকে ছাড় দিতে প্রস্তুত না ।এ নিয়ে তুমুল ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। যা চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত অবিরাম চলতে থাকে । এবার যেন হারামে রক্তপাত আর খুন-খারাবি ছাড়া আর কোন সমাধান নেই । শেষমেষ একটি সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসেন তাদের প্রবীণতম ব্যক্তি আবূ উমাইয়া । সমাধান পেশ করেন যে, পরবর্তী যে একূ এপ কাজে ব্যক্তিটি কা’বার ফটক দিয়ে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন, তাকেই এই বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব দেওয়া হবে। সকলেই তা মেনে নেয়। আর আল্লাহর কী মহিমা! ফটক দিয়ে ঢোকা পরবর্তী ব্যক্তিটি স্বয়ং মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ।

তাকে দেখা মাত্রই সবাই বলে উঠল,“আরে! এ তো মোহাম্মদ!এমন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত মানতে আমাদের কারো কোন আপত্তি নেই।” পুরো ব্যাপার শোনার পর মোহাম্মদ ﷺ একটি কাপড় নিয়ে আসতে বললেন । হাজারে আসওয়াদ কে সেই কাপড়ে বসিয়ে ডাক দিলেন দলের প্রত্যেক গোত্রপতিকে। সবাইকে একসাথে কাপড়ে একেকটি দিক ধরে তুলতে বললেন পাথরটি। তাই করলেন সবাই। মোহাম্মদ ﷺ তারপর নিজ হাতে পাথরটি যথাস্থানে বসিয়ে দেন। চমৎকার এই সমাধান মেনে নিয়ে মারাত্মক এক কোন দল থেকে রক্ষা পেয়ে গেল সবাই।

ভূমি থেকে প্রায় দেড় হাত মিটার উঁচুতে হাজরে আসওয়াদ। আর কা’বার দরজা দুই মিটার উঁচুতে। দরজা উঁচুতে হওয়ার কারণ হলো কুরাইশরা তাদের অনুমতি ছাড়া কাউকে কা’বায় প্রবেশ করাতে নারাজ। দেয়ালের উচ্চতা তার আগের চেয়ে দ্বিগুণ করে আঠারো হাত আঠারো হাত করে বানায়। আগে ছিল নয় হাত নয় হাত করে। কা’বার ভিতরে দুই সারিতে ছয়টি স্তম্ভের ওপর পনেরো হাত উচ্চতায় স্থাপন করে একটি ছাদ। যেখানে আগে না ছিল কোন স্তম্ভ আর না ছিল কোন ছাদ।

(রাসুলে আরাবি ﷺ পৃ.৩৮)

নুবুওয়াত লাভের পূর্বে নবী ﷺ -এর গুণাবলী

নুবুওয়াত লাভের আগে থেকে মুহাম্মদ ﷺ -এর মাঝে প্রকাশিত হতো ভবিষ্যৎ নবীর অনেক গুণাবলী। শৈশব থেকেই তিনি প্রখর মেধাবী ও সচ্চরিত্র। সততা ,সাহস, ন্যায়পরায়ণতা, সুকৃতি, ধৈর্য, নম্রতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির জন্য তিনি ছিলেন সুখ্যাত। প্রিয় ভাতিজার বর্ণনা দিয়ে আবু তালিব বলেন,

“সে উজ্জ্বল ফর্সা, তাঁর বরকতেই রহমতের বৃষ্টি ঝরে ।
সে এতিমদের আশ্রয়স্থল,বিধবাদের সুরক্ষা করে”।

ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর এবং পারিবারিক দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার পাশাপাশি নবীজি ﷺ -এর সবচেয়ে পছন্দের কাজ ছিল সৃষ্টির সেবা করা। তিনি আল্লাহর দেওয়া ধন দৌলত, ইজ্জত-সম্মান, চিন্তা ফিকির ও বুদ্ধিমত্তার নিয়ামতগুলো তার বান্দাদের কল্যাণে অকাতরে ব্যয় করতেন।
ক্ষুধার্ত মানুষদের খাওয়ানো,বিধবা নারীদের সাহায্য করা,অভাবী লোকদের চাহিদা পূরণ করা নবীজি ﷺ -এর অভ্যাস ছিল।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সে সম্পর্ক রক্ষা করা ,অন্যের বোঝা বহন , আতিথেয়তা এবং দুর্দশা গ্রস্থদের স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

বনু হাশিমের অভাবী পরিবার গুলোর প্রতি তার বিশেষ সহযোগিতা জারি ছিল ।তার চাচা আবু তালিব ,যিনি তাকে দেখভাল করেছেন, তিনি আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছিলেন। নবী ﷺ

তার ছেলেদের প্রতি বিশেষভাবে যত্ন নিতেন। তাদেরকে ভ্রাতৃস্নেহের প্রদর্শন করতেন। তাদের মধ্যে আকিল রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির দশ বছর,জাফর বিশ বছর এবং আলি ত্রিশ বছর ছোট ছিলেন । একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলি (রা.) কে নিজের পরিবারের নিয়ে নেন এবং তিনি নবীজির কোলেই হেসে-খেলে প্রতিপালিত হন।

আল্লাহর রাসুল হিসেবে একদিন তিনি মূর্তিপূজার বহুত্ববাদের শেখর উপরে ফেলবেন ।এরই লক্ষণ হিসেবে তাঁর অন্তরে ছিল সমসাময়িক পৌত্তলিক সংস্কৃতির প্রতি সত্য ঘৃণা। তাই সমাজের সাথে মিশে থাকা মানুষের জীবনে কোনদিন তিনি পৌত্তলিকতা ও মাদক -কেন্দ্রিক স্থানীয় পালা-পার্বণের কোনটিতে অংশ নেননি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে জবাই করা প্রাণীর গোশত পরিহার করার ব্যাপারেও ছিলেন সদা সচেতন । মূর্তি স্পর্শ করা তো দূরের কথা, সেগুলোর কাছেও যেতেন না তিনি । বিশেষত পৌত্তলিকদের প্রধান দুটি দেবী লাত ও উজ্জা নামে কসম করার প্রথাটিকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন।

অনিশ্চিত অস্থিরতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ভেতর এক ধরনের অদৃশ্য এবং অনিশ্চিত অস্থিরতা অনুভব করতেন যার কারণ ও উৎস এবং যার ভবিষ্যৎ ও পরিণতি তাঁর জানা ছিল না । তাঁর মনে এ কথা কখনো ভুলেও জাগত না, আল্লাহতায়ালা তাকে ওহী এবং রিসালাতের দ্বারা সরফরাজ করতে যাচ্ছেন।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكَذٰلِكَ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ رُوۡحًا مِّنۡ اَمۡرِنَا ؕ مَا كُنۡتَ تَدۡرِىۡ مَا الۡكِتٰبُ وَلَا الۡاِيۡمَانُ وَلٰـكِنۡ جَعَلۡنٰهُ نُوۡرًا نَّهۡدِىۡ بِهٖ مَنۡ نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهۡدِىۡۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍۙ

এভাবেই আমি আমার নির্দেশে তোমার প্রতি ওহীরূপে নাযিল করেছি এক রূহ। ইতঃপূর্বে তুমি জানতে না কিতাব কী এবং (জানতে) না ঈমান। কিন্তু আমি একে (অর্থাৎ কুরআনকে) বানিয়েছি এক নূর, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চাই হেদায়াত দান করি। নিশ্চয়ই তুমি মানুষকে দেখাচ্ছ হেদায়াতের সেই সরল পথ

—আশ্-শূরা - ৫২

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَہِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ۫

(হে রাসূল!) পূর্ব থেকে তোমার এ আশা ছিল না যে, তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করা হবে। কিন্তু এটা তোমার প্রতিপালকের রহমত। সুতরাং তুমি কখনও কাফেরদের সাহায্যকারী হয়ো না।

—আল ক্বাসাস - ৮৬

আল্লাহতালার খাস হেকমত ও প্রশিক্ষণ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লালন পালন নিরক্ষর হিসেবে হয়। তিনি না পড়তে পারতেন, না লিখতে জানতেন! এভাবেই তিনি ইসলামের শত্রুদের অপবাদ আরোপ ও মিথ্যাচার থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন এবং নিরাপদ থাকেন। কুরআন মাজীদ এ কথা দিকে ইঙ্গিত করেছে,

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِہٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّہٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

তুমি তো এর আগে কোন কিতাব পড়নি এবং নিজ হাতে কোন কিতাব লেখওনি। সে রকম কিছু হলে ভ্রান্তপথ অবলম্বনকারীরা সন্দেহ করতে পারত।

—আল আনকাবুত - ৪৮

কুরআন মাজিদ এজন্যই তাঁকে 'উম্মি' নিরক্ষর উপাধি দিয়েছে।
বলা হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَہٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَہُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۡ

যারা এই রাসূলের অর্থাৎ উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাওরাত ও ইনজীলে, যা তাদের নিকট আছে, লিপিবদ্ধ পাবে।

—আল আ'রাফ - ১৫৭

[নবীয়ে রহমত ﷺ পৃ.১৩২]

চতুর্থ অধ্যায়: নুবুওয়াত ও মাক্কি জীবন

নবুওয়াতের আমানত যখন অর্পিত হলো

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ৪০ বছর হওয়ার পরপরই তার ধ্যান- ধারণা অনুভূতির মধ্যে গভীরতা আসে । তিনি দেখতে পান পুরো পৃথিবী ধ্বংস ও বরবাদির পথে হাঁটছে। বিশ্ব তখন অগ্নিকুণ্ডের একেবারে প্রান্তে, বরং এ কথা বলা অধিকতর সঙ্গত হবে, দোরগোড়ায় উপনীত। গোটা মানব গোষ্ঠী দ্রুতই আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হয়েছিল।

দুনিয়াতে তখন মূর্খতা ও জাহিলিয়াতের রাজত্ব চলছিল। কল্পনার ফানুস ওড়ানো এবং শিরক ও মূর্তিপূজার মহামারী চলছিল সর্বত্র ব্যাপকভাবে। এতদ্দৃষ্টে তার অস্থিরতা সৃষ্টি জগতের ও আসমান- জমিনের স্রষ্টার পথ নির্দেশনা তথা হেদায়েত ও তাঁর বিধানাবলীর অপেক্ষার চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। মনে হচ্ছিল কোনো অদৃশ্য শক্তি ও গায়েবী আওয়াজ তাকে পরিচালনা করছে, পথ দেখাচ্ছে এবং সেই বিরাট পদের জন্য তাকে প্রস্তুত করছে।

এখনই যদি তাদের সংশোধনের জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তাহলে তা সমগ্র মানবজাতির অবস্থা খুবই নাজুক আকার ধারণ করবে।
বিগত সাত বছর যাবত তিনি মাঝে মধ্যেই ফেরেশতাদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন অদৃশ্যে নূরের ঝলকও দেখতে পেতেন। নবীজি ﷺ -এর কল্পনা ছিল না যে আল্লাহতালা তাকে সর্বশেষ রাসূলের মর্যাদা দান করবেন।

সে সময় একাকী ও নির্জনে থাকাটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তিনি সকলের আলাদা হয়ে নিঃসঙ্গ থাকাতেই বিরাট তৃপ্তি পেতেন, শান্তি পেতেন, ফলে তিনি মক্কা থেকে বহু দূরে চলে যেতেন এমনকি শহরের বাড়িঘর গুলো তার দৃষ্টি সীমা থেকে হারিয়ে যেত।তিনি মক্কার পাহাড় ও বিরান ভূমিতে সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন ।
অন্তরের অশান্তি বাড়তে থাকলে একসময় তিনি আশ্রয় নেন হেরা গুহায়।এখানে তিনি একা একা দীর্ঘ সময় কাটাতেন ।সকল মূর্তি ও কাল্পনিক উপাস্য কে ছেড়ে এখানে অদ্বিতীয় সত্য আল্লাহর উপাসনার সূচনা হয় তার মাধ্যমে।

একাকীত্ববাদী পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর বাছাইকৃত নির্দিষ্ট কিছু কর্মধারা অনুসরণ করে মুহাম্মদ ﷺ পরপর তিন বছর রমাদান মাসগুলো গুহায় অতিবাহিত করেন ।এরপর তিনি মক্কায় ফিরে গিয়ে তাগাদা করে ঘরে যেতেন। এভাবে নবীজির ৪০ বছর পূর্ণ হয়। ৪০তম বছরই হলো ,মানব জীবনের সর্বাধিক বিবেচনায় পরিপূর্ণতার বছর।সাধারণত এই বয়সেই নবীদের নবুওয়াত প্রদান করা হয়ে থাকে। ৪০ বছর বয়সে মুহাম্মদ ﷺ নবুয়তের কিছু লক্ষণ লক্ষ্য করতে শুরু করেন ।এ সময় নবীজি ﷺ সত্য ও কল্যাণকর স্বপ্ন দেখতেন, আর যা দেখতেন বাস্তবে তাই ঘটতো। আবার আলো দেখতে পেতেন এবং আওয়াজ শুনতেন ।কখনো কখনো পথ অতিক্রম করার সময় বৃক্ষ এবং পাথর থেকে আওয়াজ শুনতেন ‘আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসুল আল্লাহ’। তখন তিনি পিছন থেকে ফিরে তাকাতেন। তখন কাউকে দেখা যেত না।

রাসুল ﷺ বলেছেন,

“মক্কার একটি পাথরকে আমি চিনি যে আমার নবুয়তের পূর্বে আমাকে সালাম দিত।” (মুসলিম,২২৭৭)

[(সিরাতুন নবী ﷺ পৃ.১৩৩,)-(রাসুলে আরাবি ﷺ পৃ.৪০)]

নবুয়তের সূচনা ও ওহীর অবতরণ

যথারীতি তিনি তৃতীয় রমাদান ও হেরা গুহায় একাকী আল্লাহর জিকির ও ইবাদত করছিলেন। তখন নবী ﷺ-এর বয়স ৪১ চলছিল। হঠাৎ সেখানে জিবরীল আলাইহিস সালাম অবতরণ করেন এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে ওহী ও নবুয়াত দানে সৌভাগ্য-মন্ডিত করেন। বহু হাদিসের বর্ণনাকারী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর মুখে শোনা যায় সাধারণ এক মানুষের নবী হয়ে ওঠার মুহূর্তটির সম্পর্কে:

নবী ﷺ -এর ওপার ওহীর সূচনা হয় ঘুমের মধ্যে ভালো ভালো স্বপ্ন দেখার মাধ্যমে। স্বপ্নে যা দেখতেন তা হুবহু সেভাবেই ঘটতো, প্রভাতের আলোর ন্যায় (সুস্পষ্ট)। এরপর একসময় তার কাছে একাকীত্ব প্রিয় হয়ে ওঠে। হেরা গুহায় তিনি কয়েক দিন ও রাত ধ্যান করে কাটাতেন। বেশ কিছুদিন থাকার মত খাবার-পানি সাথে নিয়ে যেতেন তিনি। পরে কোনো এক সময় খাদিজার কাছে ফিরে এসে আবারো জিনিসপত্র গুটিয়ে রওনা হতেন। কয়েকদিন

ধরে এরকমই চলছিল। অবশেষে একদিন তিনি হেরা গুহায় থাকাকালে এক ফেরেশতা তাঁর কাছে আসে সত্যের বাণী নিয়ে।
ফেরেশতা এসে বলেন , "পড়ুন!" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি পড়তে জানি না"ফেরেশতা তাকে জোরে সজরে চাপ দিয়ে সহ্যের সীমা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে আবারো বললেন, "পড়ুন!"

মুহাম্মদ ﷺ বললেন , "আমি পড়তে জানি না!" ফেরেশতা আবারো আগের মতো চাপ দিয়ে বললেন, "পড়ুন!"

মুহাম্মদ ﷺ একইভাবে বললেন, "আমি পড়তে পারি না!" তৃতীয়বারের মতো চাপ দিয়ে ছেড়ে দেয়ার পর ফেরেশতা বললেন ,

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ
خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۚ
اِقۡرَاۡ وَ رَبُّکَ الۡاَکۡرَمُ ۙ
الَّذِیۡ عَلَّمَ بِالۡقَلَمِ ۙ
عَلَّمَ الۡاِنۡسَانَ مَا لَمۡ یَعۡلَمۡ ؕ

পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি (সব কিছু) সৃষ্টি করেছেন।
তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত দ্বারা ।
পড় এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব।
যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।
মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।

—(আল আলাক - ১-৫)

হযরত খাদিজা রা.-এর ঘরে

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আকস্মিক ঘটনায় খুবই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন, কেননা এর আগে আর কখনো এমন ধরনের ঘটনা তার সঙ্গে ঘটেনি। আর এ ধরনের কথাও তিনি আর কখনো শোনেননি। নবুওয়াত ও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের যুগ দীর্ঘকাল হয় গত হয়ে গেছে।

অতএব ,তিনি বিপদের আশঙ্কা করতে লাগলেন এবং নিজের ঘরে ফিরে এলেন।ভয়ের কারণে তার হৃদপিন্ডের গতির প্রচন্ড বেড়ে গেছে। তিনি ঘরে পৌঁছেই হযরত খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহাকে বলতে লাগলেন , "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও !আমার বিপদের আশঙ্কা হচ্ছে!"

খাদিজা তার গায়ে চাদর জড়িয়ে দিয়ে তাকে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, "কি হয়েছে সেটা তো বলবেন"! খানিক ধাতস্থ হয়ে নবীজি ﷺ হেরা গুহায় ঘটে যাওয়া সব কিছুই বর্ণনা দিলেন। তারপর বললেন , "আমি আমার জীবন- নাশের আশঙ্কা করছি!!"

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন "আল্লাহর শপথ! এমন কখনো হবে না। আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না ।কারণ, আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায়ের বোঝা নিজে বহন করেন ,গরিব দুঃখীদের সাহায্য করেন, এবং ভালো কাজে সহযোগিতা করে থাকেন"।

এরপর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মুহাম্মদ ﷺ -কে তার এক জ্ঞাতি ভাইয়ের কাছে নিয়ে গেলেন। ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল, মূর্তি পূজা ত্যাগ করে তিনি ঈসা আলাইহিস সালামের দিন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষা পড়তে ও লিখতে জানতেন। সেসময় তিনি অতিশয় বৃদ্ধ এবং দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

খাদিজা বললেন, "ভাই ,শুনুন তো আপনার ভাতিজা কি বলে"।

ওয়ারাকা বললেন, "ভাতিজা কি হয়েছে?" নবী ﷺ তার কাছে পুরো ঘটনা বিস্তারিতভাবে বললেন। সব শুনে ওয়ারাকার বিস্ময়কর জবাব, "আরে! এ তো সেই একই ফেরেশতা যাকে আল্লাহতালা মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছেও পাঠিয়েছিলেন! ইশ্! আমি যদি এখন যুবক থাকতাম! তোমার কওম যেদিন তোমাকে এই শহর থেকে বের করে দিবে সে সময় পর্যন্ত আমি জীবিত থাকতাম!"

"তারা আমাকে বের করে দিবে ? " অবাক হয়ে বলেন মুহাম্মদ ﷺ!

"হ্যাঁ! তোমার মত এই বিষয় যাদের কাছে এসেছিল , তাঁদের সবাই এ-রকম শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছেন। তুমি বহিষ্কৃত হওয়ার সময় যদি বেঁচে থাকি, তাহলে অবশ্যই সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করবো তোমায়।" এর কিছু দিন পর ওয়ারাকার মৃত্যু হয় এবং আসা বন্ধ হয়। (বুখারি,০৩; মুসলিম ১৬০)

নুবুওয়াত ও ওহি সূচনার তারিখ

উপরোক্ত ঘটনা ওহী অবতীর্ণ হওয়ার নুবুওয়াত-প্রাপ্তির সর্বপ্রথম ঘটনা। এটি সংঘটিত হয়েছে রামাদান মাসের কদরের রাত্রে(লাইলাতুল কদর -এ)

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

شَہۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡہِ الۡقُرۡاٰنُ

রমযান মাস- যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে,
—আল বাকারা - **১৮৫**

আবার অন্য স্থানে বলেছেন,

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰہُ فِیۡ لَیۡلَۃِ الۡقَدۡرِ ۚ

নিশ্চয়ই আমি এটা (অর্থাৎ কুরআন) শবে কদরে নাযিল করেছি।

—আল ক্বদ্‌র - **১**

ওহীর বিরতি ও পুনরাবৃত্তি

হেরা গুহার সে ঘটনার পর কোনো ওহী আসা ছাড়াই বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে যায় । মুহাম্মদ ﷺ -এর দুশ্চিন্তা হয় যে, আল্লাহ মনে হয় তাকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু কেন? হতাশায় মাঝে মাঝে তিনি পাহাড় থেকে লাফ দিতে চাইতেন । কিন্তু ঠিক সেই সময়টায় জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর উপস্থিতি অনুভূত হতো, ফলে শান্ত হয়ে যেতেন তিনি। আসলে এই বিরতিটুকু পরের বার ওহি লাভের কষ্ট সামলাতে মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রস্তুত করে। ভয় দূর করে এবং

নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করে। এ কারণে বরং তিনি ওহীর প্রতি একধরনের আগ্রহ ও টান অনুভব করেন। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

মুহাম্মদ ﷺ একদিন হেরা গুহা এবাদত শেষে পাহাড় বেয়ে নাম ছিলেন। এমন সময় আরেকটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে ।তার নিজের বর্ণনায় ঘটনাটি এমন :

“পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকায় আসতেই কাউকে আমাকে ডাকতে শুনলাম। ফলে আমি আমার ডানে তাকালাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। বামে তাকালাম সেখানেও কিছু নেই। সামনে তাকালাম ,পিছনে তাকালাম কিন্তু কিছুই দেখলাম না। এরপর আমি মাথা তুলে দিগন্তপানে তাকালাম। দেখি হেরা গুহায় আমার কাছে যিনি এসেছিলেন ,সেই ফেরেশতা আসমান ও জমিনের মাঝে বিরাট এক চেয়ারে বসে আছেন। তাঁকে দেখে আমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। এরপর দ্রুতপায়ে বাসায় ফিরে খাদিজাকে বললাম, “আমায় চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! আমায় চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে কম্বল পরিয়ে দাও আর আমার উপর একটু ঠান্ডা পানি ঢালো!” ফলে সে আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয় এবং ঠান্ডা পানি ঢালে অতঃপর অবতীর্ণ হতে শুরু করে __

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
قُمْ فَاَنْذِرْ
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ
وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

হে বস্ত্রাবৃত!
ওঠো এবং মানুষকে সতর্ক কর।
এবং নিজ প্রতিপালকের তাকবীর বল (মহিমা ঘোষণা কর)।
এবং নিজ কাপড় পবিত্র রাখ
এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।
এবং অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অনুগ্রহ করো না,
এবং প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন কর

—আল মুদ্দাছ্ছির - ১-৭

এই ঘটনা সালাত ফরজ হওয়ার পূর্বেই ঘটেছিল ।এরপর থেকে ওহি ধারাবাহিকভাবে নাযিল হওয়া আরম্ভ হয়। (বুখারি ৪৯২৬)

প্রথম ওহির মাধ্যমে মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় ওহীর মাধ্যমে তাঁকে রাসূল হিসেবে নির্বাচিত করা হলো।

(রাসুলে আরাবি ﷺ পৃ.৪০-৪৪)

পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার

নবি ও রাসুল হিসেবে নিজের দায়িত্ব গুলো দৃঢ়ভাবে পালন করতে তৈরি হন মুহাম্মদ ﷺ। উক্ত আয়াত গুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকেই নবি ﷺ মানুষকে আল্লাহর প্রতি, ইসলামমের প্রতি দাওয়াত দেওয়া আরম্ভ করে দেন। যেহেতু আরব জাতি মূতিপুজারি,অগ্নিপূজারি ছিল, নিজ পূর্বপুরুষের ভ্রান্ত রীতি-নীতিকেই নির্ভুল ও সঠিক মনে করতো,তাদের অহংকার ও ছিল খুব বেশি, সামান্য বিষয়েই খুনাখুনি ও রক্তপাত করা ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য — এই সব বিষয় সামনে রেখেই আল্লাহ তায়ালা রাসুল ﷺ-কে দাওয়াতের কাজ গোপনে গোপনে করার নির্দেশ দেন। শুধু তাদেরই দাওয়াত দেওয়ার জন্য আদেশ করেন,যারা সত্য গ্রহণে আগ্রহী এবং যাদের নিকটে ক্ষতির আশঙ্কা নেই । এজন্য নবি ﷺ সর্বপ্রথম নিজ পরিবার, গোত্র এবং কাছের বন্ধু বান্ধবদের দাওয়াত দিতে থাকেন

(রাসুলে আরাবি ﷺ পৃ.৪৫)

প্রথম পর্যায় : গোপনে ইসলাম প্রচার

রাসূল (ﷺ)-এর ওপর যখন প্রথম ওহি নাজিল হয়, তখন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি আদিষ্ট ছিলেন না। তখন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধান নাজিল হতো।

তখন কিছুদিন ওহি নাজিলের ধারা বন্ধ থাকে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন ওহি নাজিল শুরু হয়, তখন তাতে রাসূল (ﷺ) -কে ইসলাম প্রচার করতে আদেশ করা হয়; কিন্তু তখন পুরা পৃথিবী ছিল অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। বিশেষত আরবদের অহংকার এবং পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুসরণ তাদেরকে সত্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া থেকে বিরত রাখে। এ জন্য আল্লাহর প্রজ্ঞার দাবি ছিল যে, রাসূল (ﷺ) কে প্রথমেই প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করতে না দেওয়া। নাহয় শুরুতেই মানুষ ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। সুতরাং রাসূল (ﷺ) প্রথমে তাঁর একান্ত পরিচিতজন এবং যাঁদের প্রতি আস্থা ছিল অথবা নিজ দূরদর্শিতায় যাঁদের মধ্যে কল্যাণের নিদর্শন দেখতে পেতেন, শুধু তাঁদেরই দাওয়াত দিতে থাকেন। দাওয়াতের এ পন্থায় প্রথমে তাঁর পুণ্যাত্মা স্ত্রী খাদিজা রা., আবু বকর রা., চাচাতো ভাই আলি রা. ও পালকপুত্র জায়েদ ইবনু হারিসা রা. ইসলামগ্রহণ করেন।

আবু বকর রা. ইসলামগ্রহণের আগে থেকেই রাসূল (ﷺ) এর বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এবং সচ্চরিত্র সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ফলে রাসূল (ﷺ) যখন তাঁকে তাঁর রিসালাত তথা নবি হওয়ার সুসংবাদ দেন, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।

আবু বকর রা. তাঁর গোত্রের সর্বজনমান্য ব্যক্তি ছিলেন। সব বিষয়ে লোকেরা তাঁর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখত। ইসলাম গ্রহণের পর তিনিও সে-সকল লোকের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন, যাঁদের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পেতেন। তাঁর দাওয়াতের ফলেই উসমান ইবনু আফফান রা., আবদুর রাহমান ইবনু আউফ রা., সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা., জুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা., তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ রা. প্রমুখ সাড়া দেন। আবু বকর রা. তখন তাঁদের নিয়ে রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং তাঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন।

তাঁদের পর আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা., উবায়দুল্লাহ ইবনু হারিস রা., সায়িদ ইবনু জায়েদ আদাবি রা., আবু সালামা মাখজুমি রা., খালিদ ইবনু সায়িদ ইবনুল আস রা., উসমান ইবনু মাজউন রা. এবং তাঁর দুই ভাই কুদামা ইবনু মাজউন রা. ও উবায়দুল্লাহ ইবনু মাজউন রা., আরকাম ইবনু আরকাম রা. প্রমুখ সাহাবি ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন। তাঁরা সবাই কুরাইশি ছিলেন। কুরাইশের বাইরে থেকে সুহাইব রুমি রা., আম্মার ইবনু ইয়াসির রা., আবু জার গিফারি রা. ও আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. ইসলাম গ্রহণ করেন।

তখন পর্যন্ত গোপনে গোপনে ইসলামের দাওয়াত চলছিল। ইবাদত-বন্দেগিসহ অন্য সব বিধান গোপনেই পালন করা হতো। এমনকি পিতা পুত্র থেকে, পুত্র পিতা থেকে লুকিয়ে নামাজ আদায় করতেন। এভাবে মুসলিমদের সংখ্যা যখন ৩০ জনের বেশি হয়ে যায়, তখন রাসূল (ﷺ) তাঁদের জন্য একটি বড় ঘর নির্ধারণ করে দেন। তাঁরা সবাই সেই ঘরে জমায়েত হতেন এবং রাসূল (ﷺ) তাঁদের দীন শিক্ষা দিতেন।

এ পদ্ধতিতে তিন বছর ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তখন কুরাইশের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের দেখাদেখি আরও অনেকেই তখন মুসলমান হন। একপর্যায়ে এ সংবাদ পুরো মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে, ফলে বিভিন্ন জায়গায় মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হতে থাকে। এভাবে ক্রমেই ইসলামের সত্যবাণী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের ঘোষণা দেওয়ার সময় চলে আসে।

দ্বিতীয় পর্যায় : প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

তিন বছর পর বিপুলসংখ্যক নারী-পুরুষ যখন ইসলামে প্রবেশ করতে থাকেন এবং মানুষের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক চর্চা হতে থাকে, তখন প্রকাশ্যে মানুষের কাছে এর দাওয়াত পৌঁছে দিতে রাসূল (ﷺ) আদিষ্ট হন। আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেন;

فَاصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَاَعۡرِضۡ عَنِ الۡمُشۡرِکِیۡنَ ۝

সুতরাং তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হচ্ছে, তা প্রকাশ্যে মানুষকে শুনিয়ে দাও। (তথাপি) যারা শিরক করবে তাদের পরওয়া করো না।

—আল হিজ্‌র - ৯৪

তিনি তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর আদেশ পালন করেন এবং সাফা পাহাড়ে উঠে কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকেন। কুরাইশের সব গোত্রের লোকজন জড়ো হলে রাসূল (ﷺ) তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'আমি যদি তোমাদের কাছে এ সংবাদ দিই যে, এক বিরাট লুণ্ঠনকারী বাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে এবং শীঘ্রই তোমাদের সব ধনসম্পদ তারা লুট করে নিয়ে যাবে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস

করবে?' উপস্থিত সবাই তখন একবাক্যে বলে ওঠে, 'নিঃসন্দেহে আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করব। কেননা, আজ পর্যন্ত কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি।' রাসূল (ﷺ) তখন বলেন, 'আমি তোমাদের এই সংবাদ দিচ্ছি যে, তোমরা যদি তোমাদের ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ না করো, তাহলে আল্লাহর কঠিন আজাব তোমাদের ওপর আপতিত হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার জানামতে, পৃথিবীতে কোনো মানুষ তার সম্প্রদায়ের জন্য এমন উত্তম কোনো উপহার নিয়ে আসতে পারেনি, যা আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে, আমি তোমাদের জন্য ইহ-পরকালের অবারিত কল্যাণ নিয়ে এসেছি। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন এই দীনের প্রতি তোমাদের আহ্বান করি। আল্লাহর শপথ, আমি যদি পুরো দুনিয়াবাসীর সঙ্গে মিথ্যা বলতাম, তবু তোমাদের সঙ্গে মিথ্যা বলতাম না। আমি যদি পৃথিবীর সবাইকে ধোঁকা দিতাম, তবু তোমাদের ধোঁকা দিতাম না। সেই মহান পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি এক, যাঁর কোনো শরিক নেই; আমি বিশেষভাবে তোমাদের প্রতি এবং সাধারণভাবে দুনিয়াবাসীর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি ও রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।

নবিজি ﷺ-এর এই সতর্কবাণী শোনা শেষে সবাই আস্তে আস্তে ফিরে চললো।সবাই এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।কেউ সমর্থন বা বিরোধিতা করেছে বলে জানা যায় না ।তবে আবু লাহাব জঘন্য আচরণ করে বলেছিল, “ধ্বংস হয়ে যাও তুমি!এসব বলার জন্যই কি তুমি আমাদের জমা করেছিলে?”

এর প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তায়ালা একটি সুরা অবতীর্ণ করলেন,

تَبَّتۡ یَدَاۤ اَبِیۡ لَہَبٍ وَّتَبَّ

আবু লাহাবের দু’হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজে ধ্বংস হয়েই গেছে।

مَاۤ اَغۡنٰی عَنۡہُ مَالُہٗ وَمَا کَسَبَ

তার সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি

سَیَصۡلٰی نَارًا ذَاتَ لَہَبٍ

অচিরেই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে

وَّامۡرَاَتُہٗ ؕ حَمَّالَۃَ الۡحَطَبِ ۚ

এবং তার স্ত্রীও, কাষ্ঠ বহনরত অবস্থায়

فِیۡ جِیۡدِہَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ ٪

গলদেশে মুঞ্জ (তৃণ বিশেষ)-এর রশি লাগানো অবস্থায়।

[—আল লাহাব - ১-৫]

স্বগোত্রীয়দের বিদ্রুপ ও শত্রুতা সত্ত্বেও নবী ﷺ তাঁর মিশনে নিয়ে অবিচল থাকেন। সভা - সমাবেশ মাহফিল কিংবা মজলিস যেখানে যাকে পেতেন ইসলামের দাওয়াত দিতেন । কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে সেই একই বার্তা দিতেন, যুগে যুগে যা দিয়ে গেছেন আগেরকার নবি-রাসুলগণ। তিনি বলতেন ,

یٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰہَ مَا لَکُمۡ مِّنۡ اِلٰہٍ غَیۡرُہٗ

“হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো । তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই।” [সুরা আরাফ,৮৫]

এর সাথে সাথে নবী ﷺ সবার সামনে প্রকাশ্যে আল্লাহতালার ইবাদত শুরু করে দেন । কাবাব প্রাঙ্গণের দিন দুপুরে সালাত আদায়ও শুরু করেন । ধীরে ধীরে সফলতা পেতে থাকে তাঁর দাওয়াত । একের পর এক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। সে সাথে মুমিন-কাফিরে বাড়তে থাকে ফাটল। তৈরি হয় বৈরিতা। এমনকি একই পরিবারের সদস্যদের মাঝেও শত্রুতা দানা বাঁধে। পরিবার, গোত্র, সংস্কৃতির মতো মহাপবিত্র বন্ধনের চেয়ে ইসলাম ধর্মকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার এই ক্ষমার অযোগ্য পাপ (!) ক্রমেই কুরাইশদের রাগ বাড়িয়ে দিতে থাকে ।

[রাসূলে আরাবি ﷺ পৃ. ৫৩-৫৪]

আরববাসীর বিরোধিতা, শত্রুতা এবং রাসূল (ﷺ) এর দৃঢ়তা

রাসূল (ﷺ) এভাবেই মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান এবং দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন। তবে আরবরা যখন এটা জানতে পারে যে, রাসূল (ﷺ) এর ওপর যে ওহি নাজিল হয়, তাতে তাদের মূর্তিসমূহের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা হয় এবং যারা এসব মূর্তির পূজা করছে, তাদের মূর্খতা প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে, তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতায় লেগে যায়। তাদের একটি দল তখন রাসূল (ﷺ) এর চাচা আবু তালিবের কাছে এসে বলে, তিনি যেন তাঁকে এ ধরনের কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখেন; অথবা তাঁর সাহায্য- সহযোগিতা করা থেকে তিনি হাত গুটিয়ে নেন। আবু তালিব তখন অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় কৌশলী জবাব দিয়ে তাদের বিদায় দেন। এদিকে রাসূল (ﷺ) পূর্ণ উদ্যমে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং মানুষকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে যান। আরবরা যখন দেখে এভাবে কাজ হচ্ছে না, তখন আবারও তার কাছে গিয়ে শক্ত ভাষায় বলে, 'হয় আপনি আপনার ভাতিজাকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখুন, নাহয় আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামব, যে পর্যন্ত-না দু-দলের একদল ধ্বংস হয়ে যায়।'

আরব গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে নবিজির জবাব

এবার আবু তালিব বেশ চিন্তায় পড়ে যান। তিনি রাসূল (ﷺ) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। রাসূল (ﷺ) তখন তাঁকে বলেন, 'চাচা, আল্লাহর কসম, আরবের মূর্তি পূজারিরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদও এনে দেয় এবং এটা কামনা করে যে, আমি আল্লাহর বাণী তাঁর সৃষ্টির কাছে পৌঁছাব না, তবু আমি আল্লাহর বাণী প্রচার থেকে বিরত থাকব না; যতক্ষণ-না আল্লাহর দীন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে অথবা এ কাজে আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দেবো।'

আবু তালিব রাসূল (ﷺ) এর দৃঢ়তাপূর্ণ এ জবাব শুনে বলেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি নিজের কাজ চালিয়ে যাও, আমি কখনো তোমার সাহায্য-সহযোগিতা থেকে হাত গুটিয়ে নেব না।'

হাজীদের ভুল বুঝাতে কুরাইশদের বৈঠক

কুরাইশরা যখন দেখল যে, বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিব রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে রয়েছে এবং হজের মৌসুমও একেবারে নিকটবর্তী, তখন তারা ভাবনায় পড়ে যায়। তারা ভাবল, রাসূল (ﷺ) হজের মৌসুমকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং মানুষের মধ্যে তাঁর ধর্ম

প্রচারের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবেন। তা ছাড়া তারা এটাও জানত যে, রাসূল (ﷺ) এর সত্য কথায় আকর্ষণ রয়েছে, ফলে মানুষ খুব সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে এবং রাসূল (ﷺ) এর দীন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং তারা তখন সবাই একত্রিত হয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, মক্কার সব রাস্তায় নিজেদের লোক বসিয়ে রাখতে হবে। এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হজ করতে আসা লোকদের এটা জানিয়ে সতর্ক করা হবে যে, 'এখানে একজন জাদুকর রয়েছে, সে তাঁর কথার মাধ্যমে পিতা- পুত্র, স্বামী-স্ত্রী এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। তোমরা কেউ তাঁর ধারেকাছেও যাবে না।'

আল্লাহর আদেশে জ্বলেছে যে আলো, যে তা নিভিয়ে দিতে চাইবে, তার দাড়িই বরং জ্বলে যাবে।

আল্লাহর কী অপার মহিমা, তাদের এ কর্মপদ্ধতি রাসূল (ﷺ) এর দাওয়াতের কাজ করে দেয়। যদি তারা এমনটা না করত, তাহলে সম্ভবত এমনও হতে পারত যে, লোকজন তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানত না। কিন্তু তাদের এই কর্মপন্থা হজ করতে আসা লোকদের রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে জানতে উৎসাহী করে তোলে।

কুরাইশদের অত্যাচার ও রাসূল (ﷺ) এর দৃঢ়তা

এভাবে কুরাইশদের সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়; আর বিপরীতে রাসূল (ﷺ) এর দাওয়াতের কাজ আরও বেগবান হয় এবং দলে দলে লোকজন ইসলামে প্রবেশ করে, তখন তারা তাঁর ওপর নানাভাবে অত্যাচার শুরু করে। তারা মক্কার কিছু দুষ্টু ছেলেকে জড়ো করে বলে, তারা যেন রাসূল (ﷺ) এর প্রতিটি মজলিসে গিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করে এবং যেভাবে পারা যায়, তাঁকে যেন কষ্ট দেয়।

রাসূল (ﷺ) কে হত্যাচেষ্টা ও তাঁর প্রকাশ্য মুজিজা

রাসূল (ﷺ) একবার কাবা শরিফের পাশে নামাজ পড়ছিলেন। তিনি সিজদায় গেলে আবু জাহল এটাকে সুযোগ মনে করে তাঁর মাথায় পাথর দিয়ে আ/ঘাত করতে চাইল। কবি বলেন,

শত্রুর শক্তি দেখে ভয় পেয়ো না, আল্লাহর শক্তি আরও বেশি।

আবু জাহল পাথর হাতে নিয়ে যতই রাসূল (ﷺ) এর নিকটবর্তী হচ্ছিল, ততই তার হাত কাঁপতে লাগল। এমনকি তার হাত থেকে পাথরটি পড়ে যায়। চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তখন সে প্রাণভয়ে দৌড়ে সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বলতে থাকে, 'আমি যখন মুহাম্মাদের মাথায় পাথরটি ছোড়ার ইচ্ছা করি তখন দেখি, এক আশ্চর্য ধরনের উট আমার দিকে মুখ হা করে এগিয়ে আসছে এবং আমাকে খেয়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। এ ধরনের উট আমি আজ পর্যন্ত কখনো দেখিনি!' এটি এমন ঘটনা, যা কাফিরদের মজলিসে খোদ আবু জাহল স্বীকার করেছিল।

আবু জাহল ছাড়াও উকবা ইবনু আবি মুয়িত, আবু লাহাব, আস ইবনু আবদুল মুত্তালিব, ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা প্রমুখ সবসময় রাসূল (ﷺ) এর পেছনে লেগে থাকত। তাঁকে প্রাণে মে/রে ফেলার সুযোগ খুঁজত। এদের কারোরই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি; বরং অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপদস্থ অবস্থায় মৃ/ত্যুবরণ করে। কেউ বদর যু/দ্ধে তরবারির কোপে, কেউ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃ/ত্যুমুখে পতিত হয়।

কুরাইশদের বিভিন্ন প্রলোভন ও রাসূল (ﷺ) এর উত্তর

কুরাইশরা যখন দেখল, তাদের কোনো প্রচেষ্টাই কাজে আসছে না, তখন তারা পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত নেয়, তারা তাদের সবচেয়ে বিচক্ষণ নেতা উতবা ইবনু রাবিআকে রাসূল (ﷺ) এর কাছে পাঠাবে। সে তাঁকে পার্থিব সব ধরনের লোভনীয় প্রস্তাব দেবে। এর ফলে হয়তো তিনি তাঁর নতুন এ ধর্ম প্রচারের কাজ থেকে বিরত থাকবেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উতবা ইবনু রাবিআ রাসূল (ﷺ) এর কাছে যায়। রাসূল (ﷺ) তখন মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন। সে তাঁকে বলে, 'ভাতিজা, তুমি বংশমর্যাদায় আমাদের সবার চেয়ে সম্ভ্রান্ত; কিন্তু এরপরও তুমি নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছ, তাদের দেবদেবী ও তাদের সম্পর্কে তুমি নানান বাজে কথা বলছ, তোমার পূর্ব পুরুষদের মূর্খ ও বোকা বলছ। আজ তুমি সত্য করেই বলো তো, এসব কর্মকান্ড দ্বারা তোমার কী উদ্দেশ্য? এর মাধ্যমে তোমার যদি উদ্দেশ্য হয়, তুমি অনেক ধনসম্পদ সঞ্চয় করবে তাহলে শুনো, আমরা তোমার জন্য এ পরিমাণ সম্পদ জোগাড় করে দেবো যে, তুমি পুরো আরবের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী হয়ে যাবে। আর যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তুমি নেতা হবে, তাহলে আমরা সবাই এক বাক্যে তোমাকে নেতা মেনে নিতে প্রস্তুত। আমরা তোমাকে কুরাইশের সব গোত্রের নেতা বানিয়ে দেবো এবং

তোমার আদেশ ছাড়া একটি কথাও এদিক-সেদিক হবে না। যদি তোমার উদ্দেশ্য এটা হয়ে থাকে যে, তুমি আমাদের বাদশাহ হবে, তাহলে এটাও আমরা মেনে নিতে রাজি আছি। আমরা সম্মিলিতভাবে তোমাকে আমাদের বাদশাহ ঘোষণা করব। যদি (নাউজুবিল্লাহ) তোমার ওপর কোনো দুষ্ট জিনের আসর থাকে; আর ওই দুষ্ট জিনের কথবার্তা (ওহি) মানুষকে শুনিয়ে থাকো এবং তুমি একা তাকে তাড়ানোর ক্ষমতা না রাখো, তাহলে আমরা তোমার জন্য কোনো চিকিৎসক নিয়ে আসব, সে তোমাকে চিকিৎসা দিয়ে সুদ্ধ করবে।

উতবা ইবনু রাবিআর উপলব্ধি

উতবা যখন কথা বলা শেষ করল, তখন রাসূল (ﷺ) তার সব কথার উত্তরে পবিত্র কুরআনের মাত্র সুরা হা- মীম- সাজদাহ তিলাওয়াত করে শোনান। উতবা কুরআনের আয়াতগুলো শুনে হতভম্ব হয়ে যায়। সে তখন ফিরে গিয়ে গোত্রের লোকদের বলতে থাকে, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদের মুখে আমি আজ এমন কিছু কথা শুনেছি, ইতিপূর্বে যা কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, এগুলো কবিতা, গল্প বা গণকদের কোনো মন্ত্র নয়। আমার পরামর্শ হলো, তোমরা তাঁকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকো। কেননা, তাঁর যে বাণী আমি শুনেছি, আল্লাহর কসম, অচিরেই তাঁর সুমহান মর্যাদা প্রকাশ পাবে। আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি। তোমরা আমার কথা শোনো, আমার কথা মেনে নাও এবং আরও কিছুদিন অপেক্ষা করো। যদি আরবরা বিজয়ী হতে পারে, তাহলে বিনা কষ্টে তাঁর থেকে রেহাই পেলে; আর সে আরবদের ওপর বিজয়ী হলে তো তাঁর সম্মানে আমরাও সম্মানিত হব। কেননা, সে তো আমাদের গোত্রেরই লোক।'

কুরাইশরা তাদের সবচেয়ে চতুর ও বিচক্ষণ এই নেতার কথায় অবাক হয়ে যায়। তারা তখন এই বলে নিজেদের জান বাঁচায় যে, মুহাম্মাদ নিশ্চয় তাকেও জাদু করে ফেলেছেন!এভাবে কুরাইশদের কোনো কৌশলই যখন কাজে আসেনি, তখন তারা রাসূল (ﷺ), তাঁর সাহাবি ও আত্মীয়-স্বজনের ওপর বিভিন্ন নির্যাতন শুরু করে। বিলাল রা.-সহ অনেকের ওপর কঠিন নির্যাতন চালায়। আম্মার ইবনু ইয়াসির রা.-এর মাকে শুধু ইসলাম গ্রহণের অপরাধে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শ/হিদ করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটিই শা/হাদাতের প্রথম ঘটনা।

সাহাবিদের হাবশায় (হাবশার পরবর্তী নাম আবিসিনিয়া এবং বর্তমান নাম ইথিওপিয়া) হিজরতের নির্দেশ

এতদিন কুরাইশ কা/ফিররা শুধু রাসূল (ﷺ) কে অত্যাচার-নির্যাতন করে আসছিল এবং তিনি সেগুলো নীরবে সহ্য করে যাচ্ছিলেন। এবার সাহাবায়ে কিরাম এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও এই নির্যাতনের ধারা শুরু হয়।
তখন রাসূল (ﷺ) হাবশায় তাঁদের হিজরতের নির্দেশ দেন। কেননা, তাঁরা রাসূল (ﷺ) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সেই সত্যবাণী ও নুরে ইলাহি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে কোনোভাবেই রাজি ছিলেন না; বরং তাঁরাও অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সেসব জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন।

সুতরাং নবুওয়াতের পঞ্চম বছর রজবে ১২ জন পুরুষ এবং চারজন মহিলা হাবশায় হিজরত করেন। তাঁদের মধ্যে উসমান রা. ও তাঁর স্ত্রী রাসূল (ﷺ) এর মেয়ে রুকাইয়া রা.-ও ছিলেন। হাবশার বাদশাহ নাজাশি মুহাজিরদের অত্যন্ত সম্মান দেখান। তাঁরা সবাই সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। কুরাইশরা যখন এ সংবাদ পায়, তখন তারা আমর ইবনুল আস রা. ও আবদুল্লাহ ইবনু রাবিআকে নাজাশির কাছে এ বলে পাঠায় যে, 'এই লোকগুলো দুষ্কৃতকারী। আপনার রাজ্যে এঁদের অবস্থানের অনুমতি দেবেন না; বরং আমাদের হাতে সোপর্দ করুন।'

তবে বাদশাহ নাজাশি ভদ্র ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি জবাবে বলেন, 'আমি তাদের ধর্ম ও মতাদর্শ সম্পর্কে তদন্ত করার আগে তাঁদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি না।' নাজাশি তখন মুহাজিরদের ডেকে বলেন, 'তোমরা তোমাদের ধর্মমত এবং এর সত্য ঘটনাসমূহ বর্ণনা করো।' তখন জাফর ইবনু আবি তালিব রা. সামনে এগিয়ে বলেন, বাদশাহ মহান, আমরা ইতিপূর্বে অজ্ঞতার আঁধারে নিমজ্জিত ছিলাম। মূ/র্তি/পূ/জা করতাম। মৃ/ত প্রাণী খেতাম। অ/শ্লীলতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং চরিত্রহীনতায় লিপ্ত ছিলাম। আমাদের সবলরা দুর্বলদের গ্রাস করত। এই যখন আমাদের অবস্থা ছিল, ঠিক এমন সময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে একজন রাসুল পাঠান, তিনি আমাদের বংশেরই সন্তান। আমরা তাঁর বংশ, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তিনি আমাদের এই আহ্বান জানান যে, আমরা যেন মহান আল্লাহ কে এক বলে বিশ্বাস করি। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করি। মূ/র্তি/পূ/জা পরিত্যাগ করি। সত্য কথা বলি। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখি এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করি। তিনি আমাদেরকে মাহরাম নারীদের সঙ্গে বিয়ে-শাদি থেকে বারণ করেছেন। হ/ত্যা, লুণ্ঠন, মিথ্যা বলা এবং ইয়াতিমদের

সম্পদ খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। এ ছাড়া আমাদেরকে নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা এসব কথা শুনে তাঁর প্রতি ইমান এনেছি।

নাজাশি এ ভাষণ শুনে খুব মুগ্ধ হন এবং কুরাইশের দূতদের ফিরিয়ে দেন এবং নিজে মুসলমান হয়ে যান।

মুহাজিররা প্রায় তিন মাস সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বাস করে মক্কায় ফিরে আসেন। এ সময় উমর রা.-ও নবিজির দুআর বরকতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন পর্যন্ত মুসলিমদের সংখ্যা ৪০ জন পুরুষ এবং ১১ জন নারীর চেয়ে বেশি ছিল না। উমর রা. এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলিমদের শক্তি বেড়ে যায়। যাঁরা এতদিন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের কল্যাণে ইসলামের সত্যতাকে মনে প্রাণে স্বীকার করা সত্ত্বেও কুরাইশদের নির্যাতনের ভয়ে নিজেদের ইসলাম প্রকাশ করতে পারছিলেন না, তাঁরাও এখন প্রকাশ্যে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করেন। এভাবে আরব গোত্রসমূহে ইসলাম প্রসার ও উন্নতি লাভ করতে থাকে।

যখন কুরাইশরা দেখল যে, রাসূল (ﷺ) ও তাঁর সাহাবিদের সম্মান ও মার্যাদা দিন দিন বাড়ছে এবং হাবশার বাদশাহও মুসলিমদের যথেষ্ট সম্মান করছেন, তখন তারা নিজেদের পরিণতি দেখতে শুরু করে।

কুরাইশরা এবার সিদ্ধান্ত নেয়, বনু আবদুল মুত্তালিব ও বনু হাশিমের কাছে এই দাবি করা হবে, তোমাদের ভাতিজা মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে, অন্যথায় আমরা তাদের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করব।

কিন্তু বনু আবদুল মুত্তালিব তাদের এই দাবি মেনে নেয়নি। তখন তারা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি অঙ্গীকারনামা প্রণয়ন করে, যাতে বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়তা, বিয়ে-শাদি এবং বেচাকেনা সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর অঙ্গীকারনামাটি কাবাঘরের অভ্যন্তরে ঝোলানো হয়। একটি পাহাড়ের উপত্যকায় রাসূল (ﷺ) ও তাঁর সকল সাথি-সঙ্গী আর আত্মীয়-স্বজনকে বন্দি করে রাখা হয়। তখন আবু লাহাব ছাড়া বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিবের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই আবু তালিবের সঙ্গে সেই উপত্যকায় বন্দি ও অবরুদ্ধ ছিলেন। সেখানে আসা-যাওয়ার কোনো পথ ছিল না। খাদ্যদ্রব্যসহ যেসব পাথেয় সঙ্গে ছিল, তা-ও ফুরিয়ে যায়। একপর্যায়ে তাঁরা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হন। ক্ষুধার তাড়নায় গাছের পাতা পর্যন্ত খাওয়ার

পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই পরিস্থিতি দেখে রাসূল (ﷺ) দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দেন। এবার মুসলিমদের বড় এক কাফেলা হিজরত করেন, যাঁদের মধ্যে ৮৩ জন পুরুষ এবং ১২ জন নারী ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ইয়ামেনের মুসলিমরাও যোগ দেন, যাঁদের মধ্যে আবু মুসা আশআরি রা. এবং তাঁর গোত্রের লোকজনও ছিলেন।

এদিকে রাসূল (ﷺ) ও তাঁর বাকি পরিবার-পরিজন আর সাহাবিরা প্রায় তিন বছর এই জুলুম-অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে পার করেন।

[সিরাতে মুগলতাই]

এরপর কিছু লোক এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে এবং রাসূল (ﷺ) এর ওপর থেকে এই অবরোধ তুলে নিতে উদ্যোগী হয়। অপরদিকে রাসূল (ﷺ) কে ওহির মাধ্যমে জানানো হয় যে, কুরাইশদের অঙ্গীকারনামাটি উইপোকা খেয়ে ফেলেছে এবং তাতে আল্লাহর নাম ছাড়া আর কিছু নেই! রাসূল (ﷺ) লোকদের এটা জানালে তারা গিয়ে দেখে, রাসূল (ﷺ) যেমন বলেছেন, তেমনই হয়েছে। অর্থাৎ, চুক্তিনামাটি উইপোকা খেয়ে ফেলেছে। অবশেষে এ অবরোধ তুলে দেওয়া হয়।

তুফায়েল ইবনু আমর দাওসি (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ

তখন তুফায়েল ইবনু আমর দাওসি রা.—যিনি অত্যন্ত ভদ্র ও আপন গোত্রের নেতা ছিলেন- নবিজির খিদমতে উপস্থিত হন এবং ইসলামের সত্যতার সুস্পষ্ট নিদর্শন ও রাসূল (ﷺ) এর চরিত্রমাধুর্য দেখে স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি রাসূল (ﷺ) কে বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমার গোত্র আমার কথা খুব মান্য করে। আমি ফিরে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেবো। আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমার সঙ্গে এমন কোনো নিদর্শন দেন, যার মাধ্যমে আমি আমার দাবির পক্ষে তাদের বিশ্বাস করাতে পারি।' রাসূল (ﷺ) তাঁর জন্য দুআ করলে আল্লাহ তাঁর কপালে এমন একটি নুর চমকিয়ে দেন, যা অন্ধকারে এক উজ্জ্বল প্রদীপের মতো জ্বলজ্বল করত।তুফায়েল ইবনু আমর রা. যখন আপন গোত্রে ফিরে যান, তখন তাঁর মনে হয়, গোত্রের লোকেরা যদি আমার এই নুরকে কোনো বিপদ বা রোগ বলে ধারণা করে বসে এবং বলে যে, ইসলাম গ্রহণের কারণে এ রোগ আমাকে আক্রান্ত করেছে! তাই তিনি দুআ করলেন, কপালে থাকা নুরটি যেন তাঁর চিবুকে চলে আসে। আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করলেন এবং তাঁর কপালের নুরকে চিবুকে ঝুলন্ত লণ্ঠনের মতো করে দিলেন। এরপর তিনি নিজের গোত্রের লোকদের ইসলামের দাওয়াত

দিলেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করল; কিন্তু তাদের সংখ্যা তাঁর ধারণামতো যথেষ্ট ছিল না। তাই তিনি রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে গিয়ে নিজের চেষ্টা সফল হতে দুআর আবেদন করলেন। রাসূল (ﷺ) আবারও দুআ করলেন এবং বললেন, 'যাও, এবার দীনের প্রচার করো এবং নম্রতা বজায় রেখো।'

তুফায়েল রা. গোত্রের কাছে ফিরে যান এবং পুনরায় লোকদের ইসলাম প্রতি দাওয়াত দিতে থাকেন। আল্লাহর অনুগ্রহে এবার তিনি এমন সফল হন যে, খন্দক যু/দ্ধের পর ৭০-৮০টি পরিবারকে মুসলমান বানাতে সক্ষম হন। এরপর খায়বারের যু/দ্ধের সময় তাঁদের নিজের সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং তাঁরা সবাই জি/হা/দে অংশ নেন।

আবু তালিব ও খাদিজা (রা.) ই/ন্তে*কাল

এ সময়ে রাসূল (ﷺ) এর চাচা আবু তালিব ই/ন্তে*কাল করে। এই বেদনাদায়ক ঘটনা নবুওয়াতের দশম বছর শাওয়ালের মাঝামাঝিতে ঘটে। এর তিন দিন পর খাদিজা রা.-ও ই/ন্তে*কাল করেন।এ কারণেই রাসূল (ﷺ) এ বছরকে 'আমুল হুজন' বা 'শোকের বছর' বলে অভিহিত করেন।

[সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া ﷺ ; পৃষ্ঠা : ৫২-৫৫]

তায়েফে হিজরত

আবু তালিবের মৃ/ত্যুর পর কুরাইশরা রাসূল (ﷺ) এর ওপর নির্যাতনের অবাধ সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে তারা তাঁকে কষ্ট দেওয়া থেকে একটি মুহূর্তও বিরত থাকেনি। যখন মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে হতাশাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন রাসূল (ﷺ) সে বছরই অর্থাৎ, নবুওয়াতের দশম বছর শাওয়ালের শেষ দিকে জায়েদ ইবনুল হারিসা রা. কে সঙ্গে নিয়ে তায়েফে যান এবং তায়েফবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সেখানে দীর্ঘ এক মাস তাদের মধ্যে তাবলিগ ও হিদায়াতের কাজে নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু একটি লোকের ভাগ্যেও সত্যগ্রহণের সুযোগ হয়নি। উল্টো তারা তাঁকে কষ্ট দিতে শহরের কিছু বখাটে ও লম্পট ছেলেকে লেলিয়ে দেয়। এই হতভাগারা রাসূল (ﷺ) এর পেছনে লেগে যায়। যদি রাহমাতুল্লিল

আলামিনের দয়া ও অনুগ্রহ প্রতিবন্ধক না হতো, তাহলে তাঁর পবিত্র ঠোঁট নড়লেই তদের এসব অপকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে যেত। পরিণতিতে তায়েফ ও তায়েফবাসীদের নাম-নিশানা পর্যন্ত পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

এই হতভাগারা রাসূল (ﷺ) এর ওপর এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করে যে, তাঁর পা র/ক্তাক্ত হয়ে যায়। জায়েদ ইবনু হারিসা রা. যে দিক থেকেই পাথর আসতে দেখতেন, তিনি সে দিকেই দাঁড়িয়ে রাসূল (ﷺ) কে রক্ষা করতেন এবং নিজেই পাথরের আঘাত মাথা পেতে নিতেন। অবশেষে জায়েদ রা.-এর মাথাও আঘাতে আঘাতে র/ক্তাক্ত হয়ে যায়।

মক্কায় ফিরতি পথ ধরলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ । মনে একরাশ হতাশা। ‘কারনুল মানাযিল’ নামক স্থানে মেঘের ওপরে করে ভেসে আসেন জিবরিল (আলাইহিস সালাম)।দেখা দেন নবিজী ﷺ-এর সামনে । তাঁর সাথে আরো একজন ফেরেশতা।

জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, “ইনি পাহাড়ের ফেরেস্তা । আল্লাহ থেকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। যা ইচ্ছা আদেশ করেন, আপনার কথা মতো কাজ করবেন উনি।”

পাহাড়ের ফেরেশতা বললেন, “মুহাম্মদ ﷺ, আমি আপনার নির্দেশ মত কাজ করতে এসেছি। যদি বলেন, তাহলে তাইফের লোকদের আমি দুই পাহাড়ের মাঝে পিষিয়ে মেরে ফেলবো। এখন সিদ্ধান্ত আপনার।”

নবীজির মনে তখনো প্রতিশোধের কোন আগুন নেই তিনি বললেন,

بل ارجو ان اخرج ا الله من اصلابهم من
يعبد الله وحده ،لا يشرك به شيئا

“না বরং আমি আশা করি তাদের থেকেই আল্লাহ একদিন এমন প্রজন্ম বের করে আনবেন, যারা এক অদ্বিতীয় আল্লাহর দাসত্ব করবে এবং তার সাথে কাউকে শরিক করবে না” [বুখারী,৩২৩১]

দীর্ঘ এক মাস পর রহমতে আলম রাসূল (ﷺ) তায়েফ থেকে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করেন যে, তাঁর পা ছিল রক্তে রঞ্জিত; কিন্তু তখনো তাঁর পবিত্র জবান থেকে বদ-দুআর একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি।

ইসরা ও মিরাজ

নবী জীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঘটনা ইসরা ও মি’রাজ। এক রাতের কিছু অংশে নবীজি ﷺ -কে আল্লাহতায়ালা মক্কার কাবা থেকে বাইতুল মাকদিসে ভ্রমণ করান।এটাকে বলা ইসরা বা রাতের ভ্রমন।

আর আকসা থেকে নবীজিকে উর্ধ্ব আকাশে তুলে নেওয়া হয় একে বলা হয় মিরাজ বা উর্ধ্বগমন । কোরআনে ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়েছে,

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنۡ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ ﴿۱﴾

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। ১ নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর শ্রোতা এবং সব কিছুর জ্ঞাতা।

[সূরা ইসরা,১৭:০১]

এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে, একরাতে রাসূল (ﷺ) কাবার হাতিমে শায়িত ছিলেন। এমন সময় জিবরিল আ. ও মিকাইল আ. এসে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে চলুন।' রাসূল (ﷺ) কে তখন বুরাক নামক একটি বাহনে চড়ানো হয়। বুরাকের গতি এতই দ্রুত ছিল যে, যেখানে তার দৃষ্টি পড়ত, সেখানেই তার কদম পড়ত। এমন দ্রুতগতির সঙ্গে তাঁকে প্রথমে শামের আল আ/কসা মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী সকল নবি-রাসুলকে তাঁর সম্মানার্থে (বস্তুত এটা মুজিজা ছিল) সমবেত করে রেখেছিলেন। এখানে পৌঁছে জিবরিল আজান দেন এবং সকল নবি-রাসুল কাতারবন্দি হয়ে নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যান। কিন্তু সবাই এই অপেক্ষায় ছিলেন যে, নামাজের ইমামতি কে করবেন। জিবরিল আ. তখন রাসূল

(ﷺ) এর হাত ধরে তাঁকে আগে বাড়িয়ে দেন। এভাবে তিনি সকল নবি-রাসুল ও ফেরেশতার নামাজের ইমামতি করেন।

এ পর্যন্ত ছিল পার্থিব জগতের সফর, যা তিনি বুরাকে চড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন। এরপর তাঁকে আকাশসমূহেভ্রমণ করানো হয়।

এরপর রাসূল (ﷺ) সিদরাতুল মুনতাহার দিকে তাশরিফ নেন। পথিমধ্যে হাউজে কাউসার অতিক্রম করেন। এরপর জান্নাতে প্রবেশ করেন। সেখানে আল্লাহর সেসব অপূর্ব সৃষ্টি ও বিস্ময়কর নিদর্শন অবলোকন করেন, যা আজ পর্যন্ত কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের চিন্তা ও কল্পনা যে পর্যন্ত যেতে পারেনি। এরপর তাঁর সামনে জাহান্নাম উপস্থিত করা হয়, যা সব ধরনের শাস্তি আর তীব্র লেলিহান আগুনে ভরপুর ছিল, যার সামনে লোহা ও পাথরের মতো কঠিন বস্তুরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

রাসূল (ﷺ) জাহান্নামে একদল লোককে দেখতে পান যে, তারা মৃ/ত প্রাণী খাচ্ছে। তিনি জানতে চাইলেন, 'এরা কারা?' জিবরিল আ. বললেন 'এরা সে-সকল লোক, যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত। অর্থাৎ, গিবত বা পরনিন্দা করে বেড়াত।' এরপর জা/হান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এরপর তিনি আরও সামনে অগ্রসর হন, তবে জিবরিল আ. সেখানেই থেমে যান। কেননা, এখান থেকে সামনে এগোনোর অনুমতি তাঁর ছিল না। এবার তিনি আল্লাহর দর্শন বা দিদার লাভ করেন। সঠিক মতানুযায়ী এই দর্শন কেবল অন্তর দ্বারাই নয়; বরং চোখের দ্বারাও হয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-সহ সকল মুহাক্কিক সাহাবি ও ইমামের অভিমতও এটাই।

সেখানে তিনি সিজদায় পড়ে যান এবং আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তখনই নামাজ ফরজ হয়। এরপর তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। সেখান থেকে পুনরায় বুরাকে চড়ে ভোর হওয়ার আগেই মক্কায় ফেরেন।

পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে কুরাইশদের তিনটি বাণিজ্যকাফেলার পাশ দিয়ে তিনি অতিক্রম করেন। এদের কোনো কোনো ব্যক্তিকে তিনি সালামও করেন। তারা রাসূল (ﷺ) এর কণ্ঠ চিনতে

পারে এবং মক্কায় ফিরে আসার পর এর সাক্ষ্যও দেয়। ভোর হওয়ার আগেই এই বরকতময় সফর শেষ হয়ে যায়।

রাসূল (ﷺ) এর ইসরা সম্পর্কে চাক্ষুষ সাক্ষ্য সকালে কুরাইশদের মধ্যে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে এক অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হয়। কেউ হাততালি দিতে থাকে আবার কেউ অবাক হয়ে মাথায় হাত দেয়; আর কেউ কেউ বিদ্রুপের হাসি হাসতে থাকে। তারপর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে রাসূল (ﷺ) কে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। তারা জানতে চায়, 'আচ্ছা বলুন দেখি, বায়তুল মাকদিসের নির্মাণশৈলী ও আকৃতি দেখতে কেমন? পাহাড় থেকে কতটুকু দূরে অবস্থিত?' তাদের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ﷺ) বায়তুল মাকদিসের পুরো চিত্র বলে দেন। এভাবে তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে; আর তিনি সেগুলোর উত্তর দিতে থাকেন। এমনকি একপর্যায়ে তারা এমন সব প্রশ্ন করতে থাকে, একবার দেখার পর যেগুলোর উত্তর কেউ দিতে পারবে না। যেমন: মসজিদে দরজা কতটি, সিঁড়ি কতটি ইত্যাদি ইত্যাদি!

বলাবহুল্য যে, এসব বিষয় কে গণনা করে রাখে? তাই রাসূল (ﷺ) খুবই অস্বস্তি অনুভব করেন। কিন্তু তখনই মুজিজাস্বরূপ মসজিদে আকসাকে তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়; আর তিনি গুণে গুণে সবকিছু বলতে থাকেন। তখনই আবু বকর রা. বলে ওঠেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ

অর্থাৎ, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসুল।'

এবার কুরাইশরাও নীরব হয়ে যায় এবং বলতে থাকে, মসজিদে আকসার অবস্থা ও বিবরণ তো তিনি ঠিক ঠিকই বর্ণনা করেছেন। তারপর তারা আবু বকর রা. কে বলে, 'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মাদ এক রাতে মসজিদে আকসায় পৌঁছে পুনরায় ফিরে এসেছেন?' আবু বকর রা. উত্তরে বলেন, 'আমি তো এর চেয়েও বিস্ময়কর বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি, যেখানে সকাল-সন্ধার সামান্য ব্যবধানে আসমানি সংবাদসমূহ তাঁর কাছে পৌঁছে যায়, তাহলে এই সামান্য ব্যাপারে কি সংশয় থাকতে পারে?' এ কারণে তাঁর উপাধি 'সিদ্দিক' বা 'বিশ্বাসী' রাখা হয়।

[সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া ﷺ ; পৃষ্ঠা : ৫৬-৫৮)রাসুলে আরাবি ﷺ]

পঞ্চম অধ্যায়: মদীনা যুগ

মদিনায় ইসলাম

একটানা দীর্ঘ ১০টি বছর রাসূল (ﷺ) আরবের গোত্রসমূহকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। আরবের এমন কোনো মজলিস ও সভা নেই, যেখানে গিয়ে সত্যের দাওয়াত দেননি। হজের মৌসুম, উকাজের মেলা এবং জিলমাজাজ ইত্যাদিতে ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু তারা এর প্রতি উত্তরে তাঁকে সর্বপ্রকার কষ্ট দিতে থাকে এবং ঠাট্টা বিদ্রুপের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। তারা বলত, 'প্রথমে নিজের গোত্রকে মুসলমান বানান, তারপর আমাদের হিদায়াত করতে আসুন।' এভাবে দীর্ঘ সময় চলে যায়। এরপর আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন, ইসলামের প্রচার ও উন্নতি হোক, তখন তিনি মদিনার আউস গোত্রের কতিপয় লোককে রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে পাঠিয়ে দেন, যাঁদের মধ্যে আসআদ ইবনু জুরারা ও জাকওয়ান ইবনু আবদি কায়েস নামের দুজন সে বছরই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন।

পরবর্তী বছর আউস গোত্রের আরও কিছু লোক আসেন, যাঁদের ছয় বা আটজন ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (ﷺ) তখন তাঁদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কি আল্লাহর সত্যবাণী প্রচারে আমাকে সাহায্য করবে?' তাঁরা জবাব দেন, 'আল্লাহর রাসুল, বর্তমানে আমাদের আউস ও খাজরাজের মধ্যে গৃহযু/দ্ধ চলছে। আপনি এখন মদিনায় তাশরিফ নিলে আপনার হাতে বায়আতের ব্যাপারে সবাই একমত হবে না। আপনি আপাতত এক বছরের জন্য এ সিদ্ধান্ত মুলতুবি রাখুন। হতে পারে, আমাদের মধ্যে সন্ধি হয়ে যাবে এবং আউস ও খাজরাজ উভয় গোত্র মিলে একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে নেব। আগামী বছর আমরা আবারও আপনার কাছে আসব, তখন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।। পরে তাঁরা সবাই মদিনায় ফিরে যান। মদিনায় বনু জুরাইকের মসজিদে প্রথম কুরআন তিলাওয়াত করা হয়।

মূলত আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল যে, মদিনায় ইসলামের প্রসার ঘটুক। ফলে আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে মাত্র এক বছরেই অধিকাংশ ঝগড়ার মীমাংসা হয়ে যায় এবং ওয়াদামতো পরের বছর হজের মৌসুমে ১২ জন লোক মক্কায় রাসূল (ﷺ) এর কাছে যান। এর মধ্যে ১০ জন ছিলেন খাজরাজের; আর দুজন আউসের। তাঁদের মধ্য থেকে যারা গত বছর মুসলমান হননি, তাঁরাও এবার মুসলমান হয়ে যান এবং সবাই রাসূল (ﷺ) এর পবিত্র হাতে বায়আত

হন। এই বায়আত যেহেতু প্রথমে আকাবা(৯৭) নামক স্থানের কাছে হয়েছিল, তাই একে 'বায়আতে আকাবায়ে উলা' বা আকাবার প্রথম বায়আত নামে অভিহিত করা হয়।

তাঁরা মুসলমান হয়ে ফিরে যাওয়ার পর মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা শুরু হয়ে যায় এবং প্রতিটি আসরে-মজলিসে এই একটি কথারই আলোচনা চলতে থাকে।

ইসলামের প্রথম মাদরাসা

মদিনায় পৌঁছে আউস ও খাজরাজের দায়িত্বশীলগণ রাসূল (ﷺ) এর কাছে চিঠি লেখেন,

“আল্লাহর মেহেরবানিতে এখানে ইসলামের প্রচার হয়েছে। এখন এমন একজন সাহাবিকে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিন, যিনি আমাদের কুরআন শিক্ষা দেবেন, লোকদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবেন, শরিয়তের বিধান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবেন এবং নামাজের সময় ইমামতি করবেন।**”**

তাঁদের চিঠি পেয়ে রাসূল (ﷺ) তখন মুসআব ইবনু উমায়ের রা.-কে লোকদের কুরআনের শিক্ষা দিতে মদিনায় পাঠান। এভাবে ইসলামের প্রথম মাদরাসার ভিত্তি স্থাপিত হয় মদিনায়।

পরের বছর হজের মৌসুমে মদিনা থেকে বিরাট এক কাফেলা মক্কায় আসে। তাঁদের মধ্যে ৭০ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা ছিলেন। রাসূল (ﷺ) তাঁদের স্বাগত জানান এবং রাতে আকাবার কাছে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মধ্যরাতে সবাই জমায়েত হন। রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে তাঁর চাচা আব্বাস রা.-ও উপস্থিত ছিলেন। তবে তখনো তিনি ইমান আনেননি।

যখন সবাই সমবেত হন, তখন আব্বাস রা. উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে বলেন, 'এ হচ্ছে আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ। সর্বদা আপন গোত্রে সম্মান ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করে আসছে। আপনারা যাঁরা তাঁকে মদিনায় নিয়ে যেতে চাইছেন, তাঁরা ভেবে দেখুন, যদি আপনারা তাঁর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করতে পারেন এবং শত্রুদের হাত থেকে তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে পারেন, তবে এ দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসুন। অন্যথায় তাঁকে তাঁর নিজের গোত্রেই থাকতে দিন।'

জবাবে মদিনার কাফেলা প্রধান বলেন, 'নিশ্চয় আমরা এই দায়িত্ব নিচ্ছি এবং তাঁর সঙ্গে কৃত বায়আতের পূর্ণ বাস্তবায়নই আমাদের একমাত্র কাম্য।' এ কথা শুনে এই অঙ্গীকার ও বায়আতকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে আসআদ ইবনু জুরারা রা. দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে মদিনাবাসী, একটু অপেক্ষা করো। তোমরা কি বুঝতে পারছ আজ তোমরা কোন বিষয়ে বায়আত করতে যাচ্ছ? বুঝে নাও, এই বায়আত গোটা আরব ও অনারবের বিরোধিতা এবং মোকাবিলার অঙ্গীকার। যদি তোমরা এটাকে পূরণ করতে পারো, তবেই বায়আত সম্পাদন করো। অন্যথায় নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে দাও।' এ কথা শুনে সবাই একবাক্যে বলে ওঠেন, 'আমরা কোনো অবস্থাতেই এ বায়আত থেকে পিছু হটব না।'

এরপর তাঁরা বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমরা যদি এই অঙ্গীকার পূরণ করি, তাহলে আমরা কী প্রতিদান পাব?' তিনি বলেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত।' এ কথা শুনে সবাই বলে ওঠেন, 'আমরা এতেই সন্তুষ্ট আছি। আপনি আপনার পবিত্র হাত বাড়িয়ে দিন, আমরা বায়আত করব।' তিনি তখন হাত বাড়ান আর সবাই তাঁর বায়আতলাভে ধন্য হন। আল্লাহ ই ভালো জানেন, রাসূল (ﷺ) এর শুভদৃষ্টি আর সামান্য কয়েকটি কথা ওই লোকগুলোর ওপর যে কী পরিমাণ প্রভাব ফেলেছিল, মাত্র কিছু সময়ের সাহচর্যের বরকতেই পার্থিব সকল সম্পর্ক এবং সম্মান ও সম্পদের মোহ অন্তর থেকে বেরিয়ে সেখানে শুধু এক আল্লাহর ভালোবাসার রং এতটাই গাঢ় হয়ে ওঠে যে, জানমাল, মানসম্মান সবকিছু এর বিনিময়ে ত্যাগ করতে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে যান। আর এর ছাপ তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

[সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া ﷺ]

মদিনায় হিজরতের সূচনা

কুরাইশরা এই বায়আত সম্পর্কে জানতে পেরে তাদের ক্রোধের অন্ত রইল না। এ পর্যায়ে তারা মুসলিমদের কষ্ট ও নির্যাতনের কোনো পন্থাই আর বাকি রাখেনি। তখন রাসূল (ﷺ) সাহাবিদের মদিনায় হিজরত করতে বলেন। ফলে সাহাবিরা কুরাইশদের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে একজন-দুজন করে মক্কা থেকে মদিনায় যেতে থাকেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত মক্কায় রাসূল (ﷺ), আবু বকর রা., আলি রা. এবং কয়েকজন দুর্বল লোক ছাড়া আর কোনো মুসলমানই

বাকি থাকেননি। আবু বকর রা.ও হিজরতের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; কিন্তু রাসূল (ﷺ) তাঁকে বলেন, 'এখন থেকে যাও, যতক্ষণ-না আল্লাহ আমাকেও হিজরতের অনুমতি দিচ্ছেন।' ফলে তিনি রাসূল (ﷺ) এর হিজরতের নির্দেশ আসার অপেক্ষা করতে থাকেন এবং এ সফরের উদ্দেশ্যে দুটি উটও প্রস্তুত করেন। এর একটি নিজের জন্য এবং অন্যটি রাসূল (ﷺ) এর জন্য।

মদিনায় রাসূল (ﷺ) এর হিজরত

কুরাইশের কাফিররা যখন সার্বিক বিষয় জানতে পারে, তখন তারা রাসূল (ﷺ) এর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে 'দারুন নাদওয়ায়' সমবেত হয়। দারুন নাদওয়ার সেই বৈঠকে কেউ কেউ তাঁকে বন্দি করার পরামর্শ দেয়; আর কেউ দেয় দেশান্তরের পরামর্শ। তবে তাদের চতুর লোকেরা বলে, এর কোনোটিই করা উচিত হবে না। কেননা, বন্দি করা হলে তাঁর সমর্থক ও সাথিরা আমাদের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে নেবে; আর দেশান্তর করা হলে তা হবে আমাদের জন্য একেবারেই ক্ষতিকর। কেননা, এমতাবস্থায় মক্কার আশেপাশের সকল আরব তাঁর উত্তম চরিত্র, মিষ্টি কথা এবং পবিত্র কালামের অনুরক্ত হয়ে যাবে এবং তিনি তাদের সবাইকে নিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসবেন।

তখন হতভাগা আবু জাহল পরামর্শ দেয় যে, তাঁকে হত্যা করা হোক। তবে এ হত্যায় কুরাইশের সব গোত্রের একজন করে লোক অংশ নেবে, যাতে বনু আবদি মানাফ [রাসূল (ﷺ) -এর গোত্র] প্রতিশোধ নিতে না পারে। তখন উপস্থিত সবাই তার এ প্রস্তাব পছন্দ করে এবং সব গোত্র থেকে একজন করে যুবককে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়। তাদের বলে দেওয়া হয় যে, অমুক রাতে এ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

এদিকে আল্লাহ তাআলা রাসূল (ﷺ) কে তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন এবং তাঁকে দ্রুত হিজরতের নির্দেশ দেন। যে রাতে বিভিন্ন গোত্রের বহু যুবক কাফিরদের হীন যড়যন্ত্র বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে রাসূল (ﷺ) এর ঘরের চারদিক ঘেরাও করে, ঠিক সে রাতেই রাসূল (ﷺ) হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তিনি আলি রা. কে বলেন, তিনি যেন তাঁর খাটে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেন, যাতে কাফিররা এটা জানতে না পারে যে, তিনি ঘরে নেই।

এরপর রাসূল (ﷺ) যখন ঘর থেকে বের হন, তখন তাঁর দরজায় কাফিরদের যেন মেলা জমে। তিনি সুরা ইয়াসিন পড়তে পড়তে ঘর থেকে বের হন এবং فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (আমি তাদের চোখে পর্দা ফেলে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।) এই আয়াত পর্যন্ত যখন পৌঁছান, তখন আয়াতটি কয়েকবার তিলাওয়াত করেন। ফলে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের চোখে পর্দা ফেলে দেন। তারা আর রাসূল (ﷺ) কে দেখতে পায়নি। এরপর তিনি আবু বকর রা. এর বাড়িতে যান। আবু বকর রা. আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন এবং একজন পথপ্রদর্শকও প্রস্তুত করে রাখেন। এভাবে সিদ্দিকে আকবর রা. রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গী হন এবং তাঁরা উভয়ে বাড়ির পেছন দিকের ছোট একটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে সাওর' পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যান।

সাওর গুহায় অবস্থান

এবার রাসূল (ﷺ) আবু বকর রা.-কে নিয়ে সাওর পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান নেন। এদিকে কুরাইশ যুবকরা রাসূল (ﷺ) এর ঘরের বাইরে সকাল পর্যন্ত এ অপেক্ষা করে যে, রাসূল (ﷺ) কখন ঘর থেকে বেরোবেন। পরে তারা যখন জানতে পারে, রাসূল (ﷺ) এর বিছানায় আলি রা. শুয়ে আছেন, তখন বেশ অবাক হয় এবং চতুর্দিকে রাসূল (ﷺ) এর সন্ধানে নিজেদের গুপ্তচর পাঠায়। কুরাইশরা এ সময় ঘোষণা দেয়, যে রাসূল (ﷺ) কে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতে পারবে, তাকে উপহার হিসেবে ১০০ উট দেওয়া হবে। এ ঘোষণার পর বহু লোক পুরস্কারের আশায় রাসূল (ﷺ) কে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। এমনকি পদচিহ্নবিষয়ে অভিজ্ঞ কতেক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) এর পায়ের চিহ্ন ধরে খুঁজতে খুঁজতে ঠিক সেই গুহার একেবারে কাছে পৌঁছে যায়। সামান্য একটু নুয়ে তাকালেই তারা রাসূল (ﷺ) কে পরিষ্কার দেখতে পেত। এ সময় আবু বকর রা. বিচলিত হয়ে পড়েন। রাসূল (ﷺ) তাঁকে বলেন, 'ভয় পেয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।'

আল্লাহর কী মহিমা। কা/ফিরদের দৃষ্টি তখন গুহা থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং কেউ এতটুকুও ঝুঁকে তাকায়নি; বরং তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত ব্যক্তি উমাইয়া ইবনু খালফ বলে ওঠে, 'এখানে তাঁর থাকাটা অসম্ভব।' কেননা, আল্লাহর নির্দেশে তখন গৃহার প্রবেশপথে মাকড়সা রাতারাতি জাল বুনে রেখেছিল এবং বন্য কবুতর' কোথা থেকে গুহার ঠিক প্রবেশ পথে বাসা তৈরি করে ফেলেছিল!

রাসূল (ﷺ) ও আবু বকর রা. এ গুহায় একটানা তিন রাত আত্মগোপন করে থাকেন। একপর্যায়ে অন্বেষণকারীরা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।
এই তিন দিনই রাতের অন্ধকারে আবু বকর রা. এর ছেলে আবদুল্লাহ রা. গোপনে তাঁদের কাছে যেতেন এবং ভোর হওয়ার আগেই আবার মক্কায় ফিরে আসতেন। দিনভর কুরাইশদের সংবাদ সংগ্রহ করে রাতে রাসূল (ﷺ) এর কাছে তা বর্ণনা করতেন। অপরদিকে তাঁর বোন আসমা বিনতু আবু বকর প্রতিরাতে তাঁদের কাছে খাবার পৌঁছে দিতেন। যেহেতু আরবের লোকেরা পদচিহ্ন সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখত, তাই পদচিহ্নগুলো যেন মুছে যায়, এই উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ রা. তাঁর গোলামকে বলে রেখেছিলেন, সে যেন প্রতিদিন বকরি চরাতে চরাতে গুহা পর্যন্ত নিয়ে যায়, যেন তাদের পায়ের চিহ্ন মুছে যায়।

সাওর গুহা থেকে মদিনার পথে

আবু বকর রা.- এর আজাদকৃত গোলাম আমির ইবনু ফুহায়রা রা. সেই উট দুটি নিয়ে উপস্থিত হন, যেগুলোকে এই সফরের জন্যই তিনি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিতও গিয়ে উপস্থিত হন, যাঁকে তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথ দেখাতে সঙ্গে নিয়েছিলেন। রাসূল (ﷺ) এক উটে আর আবু বকর রা. অন্যটিতে আরোহণ করেন। আবু বকর রা. খিদমতের জন্য আমির ইবনু ফুহায়রাকেও নিজের পাশে বসান আর আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিত রাস্তা দেখিয়ে দিতে আগে আগে চলেন।

[সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া ﷺ ; পৃষ্ঠা : ৬৩-৬৫]

রাসূল (ﷺ) এর মুজিজা এবং উম্মু মাবাদ (রা.) ও তাঁর স্বামীর ইসলাম গ্রহণ

মদিনার পথে রাসূল (ﷺ) উম্মু মাবাদ বিনতু খালিদ রা. নামের এক মহিলার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার যে বকরিগুলো ইতিপূর্বে দুধ খরায় ভুগছিল, রাসূল (ﷺ) সেগুলোর স্তনে হাত বুলিয়ে দিলে তা দুধে ভরে ওঠে। পরে তা থেকে তিনি নিজেও পান করেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরও পান করান। আর এই বরকত এভাবেই অব্যাহত থাকে। উম্মু মাবাদ রা. এর বাড়ি থেকে রাসূল (ﷺ) চলে যাওয়ার পর তাঁর স্বামী বাড়ি ফিরে বকরির দুধ-সম্পর্কিত আশ্চর্য ঘটনা দেখে বিস্মিত হন। কারণ জিজ্ঞেস করলে উম্মু মাবাদ রা. বলেন, 'আজ আমাদের

বাড়িতে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত এক যুবক কিছুক্ষণের জন্য মেহমান হয়েছিলেন। এসব তাঁরই পবিত্র হাতের বরকত।' এ কথা শুনে তাঁর স্বামী বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমার তো মনে হচ্ছে তিনি মক্কার সেই মহান পুরুষই হবেন।' এক বর্ণনায় রয়েছে, এরপর এই বেদুইন দম্পতিও হিজরত করে মদিনায় চলে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন

কুবায় অবতরণ

এখনে থেকে রওনা হয়ে রাসূল (ﷺ) কুবায় পৌঁছান। আনসাররা যখন থেকে রাসূল (ﷺ) এর আগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন, তখন থেকেই তাঁরা তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে প্রতিদিন নিজেদের মহল্লা থেকে বেরিয়ে আসতেন। সেদিনও তাঁরা যথারীতি অপেক্ষা করে ফিরে যাচ্ছিলেন। তখন হঠাৎ একটি আওয়াজ শোনা যায়—'এতদিন তোমরা যাঁর অপেক্ষা করছিলে, তিনি চলে এসেছেন!'

রাসূল (ﷺ) কে আসতে দেখে সবাই বিপুল উদ্দীপনায় সংবর্ধনার সঙ্গে তাঁকে বরণ করেন।এ সময়ে তিনি কুবায় একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এটিই ইসলামের প্রথম মসজিদ।

মদিনায় নবিজী ﷺ-এর প্রবেশ

রবিউল আউয়ালের শুক্রবার দিন রাসূল (ﷺ) কুবা থেকে বিদায় নিয়ে মদিনার দিকে রওনা দেন। মদিনার আনসাররা তখন আনন্দের আতিশয্যে রাসূল (ﷺ) এর বাহন ঘিরে সামনে এগোচ্ছিলেন। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ-বা বাহনে আরোহী হয়ে। সবাই তখন রাসূল (ﷺ) এর উটের লাগাম ধরতে চেষ্টা করেন। তাঁদের সবারই আন্তরিক চাওয়া ছিল, তিনি যেন তাঁর ঘরের মেহমান হন এবং কিছুদিন অবস্থান করেন। মহিলা ও শিশুদের সে দিন দেখে কে! নারী ও শিশুরা গজল গেয়ে স্বাগত জানায় নবীজিকে । আজও গজলটি মুসলিমদের মুখে মুখে ধ্বনিত হয় ওই দিনটির স্মরণে, যেদিন যেদিন পূর্ণিমার চাঁদের মতো মানুষটি প্রথম পা রেখেছিলেন মদীনায় __

طلع البدر علينا ***من سنيات الوداع

وجب الشكر علينا *** ما دعا لله داع

ايها المابعوث فينا **جئت بالامر

المطاع

“পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের উপর উদিত হয়েছে
সানিয়াতুল ওয়াদা’ থেকে,

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের ওপর ওয়াজিব
যতদিন কেউ আল্লাহকে ডাকে,

ওহে আল্লাহর দূত আপনি আমাদের মাঝে
নিয়ে এসেছেন যা মান্য হবে তা কথা আর কাজে।”

সে দিন ছিল শুক্রবার। তাই রাসূল (ﷺ) যখন বনু সালিম ইবনু আউফের মহল্লায় পৌঁছান, তখন জুমুআর সময় হয়ে যায়। ফলে তিনি সেখানেই জুমুআ আদায় করে পুনরায় বাহনে সওয়ার হন।

মাসজিদে নববি নির্মাণ

তখন পর্যন্ত মদিনায় কোনো মসজিদ ছিল না, তাই যেখানে সুযোগ হতো, সেখানেই নামাজ পড়া হতো। মদিনার পথ ধরে চলছে আল্লাহর রাসূলের উটনী,আর একেকজন এসে একেকবার ধরছে তার লাগাম। মনে আশা ,উটনীটি হয়তো তার বাড়ির সামনেই থামবে আর রাসুলুল্লাহ ﷺ সে ঘরকেই বানাবেন আপন বসত। নবীজি ﷺ বললেন “ওকে ওরমতো চলতে দাও, আল্লাহই ওকে পথ দেখাচ্ছেন। অবশেষে হাঁটু গেড়ে বসলো উপনীত। কিন্তু নবীজি নামলেন না।একটু পর উটনীটি উঠে দাঁড়িয়ে অগোছালো ভাবে কিছুদূর এগিয়ে গেল। তারপর ঘুরে এসে বসলো আবার ওই আগের জায়গাতেই।আর ঠিক এই জায়গাতেই নির্মিত হয়েছে মাসজিদুন নববী(নবীর মাসজিদ)

মসজিদে নববির দেয়াল ছিল প্রথমে কাঁচা ইটের, খুঁটি ছিল খেজুরগাছ আর ছাদ খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরি। মসজিদের কিবলা ছিল বায়তুল মাকদিসের দিকে। কেননা, তখন পর্যন্ত

মুসলিমদের কিবলা ছিল বায়তুল মাকদিস। মসজিদের সঙ্গে দুটি কক্ষও তৈরি করা হয়- একটি আয়েশা রা. আর অন্যটি সাওদা রা.-এর জন্য। এরপর রাসূল (ﷺ) একজনকে মক্কায় পাঠিয়ে তাঁর পরিবারের লোকদের মদিনায় নিয়ে আসেন। এ সময় আবু বকর রা.-ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে মদিনায় নিয়ে আসেন। ফলে উম্মুল মুমিনিন সাওদা রা. এবং রাসূল (ﷺ) এর দুই মেয়ে ফাতিমা রা. ও উম্মু কুলসুম রা.-ও মদিনায় চলে আসেন। এ ছাড়া অপর মেয়ে জায়নাব রা.-কে তাঁর স্বামী আবুল আস মদিনায় আসতে দেননি, যেহেতু আবুল আস তখনো মুসলমান হননি। অপরদিকে আবু বকর রা. এর পুত্র আবদুল্লাহ রা. তাঁর মা ও দুই বোন আয়েশা রা. ও আসমা রা.কে নিয়ে মদিনায় চলে আসেন। এ পর্যায়ে কতিপয় অক্ষম ও দুর্বল মুসলমান মক্কায় রয়ে যান, যাদের সফর করে মদিনায় আসার মতো শারীরিক শক্তি ছিল না। তবে তাঁদের কেউ কেউ মদিনার উদ্দেশে বের হয়েছিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে ই/ন্তে*কাল করেন।

[রাসুলে আরাবি ﷺ পৃ.১৫৬]

অধ্যায় ৬:নবীজির যুদ্ধ জীবন

ইসলাম তার প্রচার-প্রসারে ত/রবারির মুখাপেক্ষী নয়

জি/হা*দ ফরজ হওয়ার উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও এটা হতে পারে না যে, মানুষের গলায় তরবারি রেখে মুসলমান হতে তাদের বাধ্য করা হবে; অথবা বল প্রয়োগ করে ইসলামে তাদের প্রবেশ করানো হবে। জি/হা*দের সঙ্গে সঙ্গে জিজয়ার বিধান এবং কা/ফিরদের জিম্মি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে ঠিক মুসলমানের মতোই তাদের জানমালের হিফাজত ইত্যাদি ইসলামি বিধান নিজেই এর সাক্ষ্য দেয় যে, জি/হা*দ ফরজ হওয়ার পরও ইসলাম কখনো কোনো কা/ফিরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেনি। তাই ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য জরুরি হলো, সে শান্ত মনে চিন্তা করবে যে, ইসলামে কী উদ্দেশ্যে এবং কী কী উপকারিতার নিমিত্তে জি/হা*দ ফরজ করা হয়েছে। তখন সে অবশ্যই বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, যেভাবে সেই ধর্মমত পূর্ণাঙ্গ নয়, যা বল প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে নিজের মতাদর্শের দিকে টেনে নেয়। অনুরূপ সেই ধর্মও পূর্ণাঙ্গ নয়, যে ধর্মে রাজনীতির স্থান নেই; আর সেই রাজনীতিও পূর্ণাঙ্গ নয়, যার সঙ্গে ত/রবারির সম্পর্ক নেই।

রাজনীতিহীন ধর্ম এবং ত/রবারিহীন রাজনীতি পূর্ণাঙ্গ নয়

সেই চিকিৎসক নিজের পেশায় কখনো দক্ষ হতে পারে না, যে শুধু মলম লাগানো কিংবা পট্টি বাঁধতে জানে; কিন্তু পচে-গলে যাওয়া অঙ্গসমূহের অপারেশন করতে জানে না। কবি বলেন,

আরব বা অনারব যে দলেরই সাথে থাকো
কিছুই হবে না যদি ত/রবারির সাথে কলম না রাখো।

ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন, যখন পৃথিবীর গোটা দেহে শি/রকের বিষাক্ত রোগ- জীবাণু ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা ব্যাধিগ্রস্ত একটি দেহের মতো হয়ে পড়েছে, তখন পরম করুণাময় আল্লাহ এটাকে ব্যাধিমুক্ত করতে একজন সংস্কারক ও দরদি চিকিৎসক পাঠালেন। তিনি তাঁর জীবনের ৬৩টি বছর বিরামহীনভাবে প্রতিটি অঙ্গপ্রতঙ্গ ও শিরা-উপশিরা নিরাময় করে তুলতে চিন্তা ও চেষ্টা করেছেন। ফলে সংশোধনযোগ্য অঙ্গগুলো সুস্থ হয়ে যায়; আর কিছু অঙ্গ যেগুলো একেবারেই পঁচে গিয়েছিল, সেগুলো সেরে ওঠার কোনো লক্ষণ বাকি থাকেনি; বরং প্রতিমুহূর্তে এগুলোর বিষক্রিয়া সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিলো, তখন অপারেশনের মাধ্যমে সেই অসুস্থ অঙ্গসমূহ কেটে ফেলাই ছিল যথার্থ করুণা ও প্রজ্ঞার চাহিদা। আর এটাই জি/হা*দের প্রকৃত তাৎপর্য এবং আক্রমণাত্মক ও প্রতিরোধমূলক সব অভিযানের উদ্দেশ্য।

এ কারণে ময়দানে তুমুল যু/দ্ধ চলাকালেও ইসলাম তার প্রতিপক্ষের কেবল সে- সকল লোককেই হ/ত্যার অনুমতি দিয়েছে, যাদের রোগ ছিল সংক্রামক। অর্থাৎ, যারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করত এবং প্রত্যক্ষ যু/দ্ধে অবতীর্ণ হতো। তবে তাদের নারী, শিশু এবং সে-সকল বৃদ্ধ ও ধর্মীয় পণ্ডিত, যারা যু/দ্ধে যোগ দিত না, তারা তখনো মুসলিমদের তরবারি থেকে নিরাপদ ছিল। এমনকি যে-সকল লোক কোনো চাপের মুখে বাধ্য হয়ে যু/দ্ধ করতে আসত, তারাও মুসলিমদের হাত থেকে নিরাপদ থাকত। ইকরিমা রা. বলেন, 'বদরযু/দ্ধে রাসূল (ﷺ) এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদি বনু হাশিমের কেউ তোমাদের সামনে পড়ে যায়, তবে হ/ত্যা করবে না। কারণ, সে স্বেচ্ছায় যু/দ্ধ করতে আসেনি; তাকে জোর করে আনা হয়েছে।'

বস্তুত রণাঙ্গনে উপস্থিত ও সরাসরি যু/দ্ধে লিপ্তদের মধ্য থেকেও যথাসম্ভব সে-সকল মানুষকে রক্ষা করা হতো, যাদের উত্তম চরিত্র ও সুন্দর শিষ্টাচার সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) জানতেন। নিচের ঘটনাটি আমাদের দাবির পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ :

অষ্টম হিজরিতে যখন রাসূল (ﷺ) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে এগোচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে একব্যক্তি তাঁর কাছে আসে। সে পবিত্র জি/হা*দকে জা/হিলি যুগে আরবদের সাধারণ যু/দ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর কাছে আরজ করে, 'আপনি যদি সুন্দর নারী আর লাল উট পেতে চান, তবে বনু মুদাল্লাজ গোত্রের ওপর আক্রমণ করুন।' কেননা, তাদের কাছে এ দুটি প্রচুর রয়েছে! কিন্তু এখানে যু/দ্ধ আর সন্ধির উদ্দেশ্যই ছিল অন্য রকম। অতএব, রাসূল (ﷺ) বললেন, 'মহান আল্লাহ আমাকে বনু মুদাল্লাজের ওপর আক্রমণ করতে এ কারণে বারণ করেছেন যে, তারা পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।' আলি রা. বলেন, একদিন রাসূল (ﷺ) এর কাছে সাতজন যু/দ্ধবন্দি উপস্থিত করা হয়। তিনি তাদের হ/ত্যার জন্য আমাকেই নির্দেশ দেন। ঠিক এমন সময় জিবরিল আ. এসে বলেন, 'আল্লাহর রাসূল, ছয়জনের ব্যাপারে আপনার নির্দেশ বহাল রাখুন; কিন্তু এই লোককে মুক্ত করে দিন।' রাসূল (ﷺ) কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এ লোকটি উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং দানশীল।' রাসূল (ﷺ) বলেন, 'আপনি কি নিজের পক্ষ থেকে এই সুপারিশ করছেন, নাকি এটা আল্লাহর নির্দেশ?' জিবরিল বলেন, 'মহান আল্লাহ ই আমাকে এর আদেশ করেছেন।

সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া ﷺ ; পৃষ্ঠা : ৭৩-৭৫

ইসলামি জি/হা*দ ও পাশ্চাত্যের যু/দ্ধ

ইসলামি জি/হা*দ তথাকথিত সভ্যতার দাবিদার ইউরোপীয় জাতিসমূহের মতো পৃথিবী-বিধ্বংসী যু*দ্ধ ছিল না, যাতে শুধু নিজেদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে নারী-পুরুষ, দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে শহর-নগর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ধ্বংস করা হয়। কবি আকবর ইলাহাবাদি চমৎকার বলেছেন,

ধ্বংসবীণা বেজে উঠেছে,
বিনাশ করেছে ঘর-দোর আর মানুষের প্রাণ
গোলার আঘাতে কেঁপে উঠেছে মাঠঘাট
জ্বলেপুড়ে সবকিছু ভস্ম হয়ে যাবে এবার।

তবে বাস্তব সত্য এটাই যে, মানুষ অন্যের চোখে সামান্য জিনিস পড়লেও তা দেখতে পায়; কিন্তু নিজের চোখে যদি কাঠের টুকরোও এসে পড়ে, সেটা দেখে না। কবি আকবর ইলাহাবাদি যথার্থই বলেছেন,

নিজের দোষ দেখে না, শুধু অন্যের ওপর মিথ্যা অভিযোগ দেয় ইসলাম নাকি তরবারির জোরে ছড়িয়েছে, এমন কুৎসা রটায় এতকিছু বলে, তবু এটা বলে না- তোপ কামান তবে কী ছড়ায়?

মোটকথা, আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় প্রকার জি*হা/দের উদ্দেশ্য ছিল শুধু উত্তম চরিত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটানো, ইসলামের নিরাপত্তা বিধান এবং ইসলাম প্রচারের পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হতো, সেগুলোর অপসারণ।(১২৫)

এসব ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাতের পর যেভাবে ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ ড্যাভিড স্যামুয়েল মারগোলিয়াথ (David Samuel Margoliouth) ও অন্যদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি জি*হা/দের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে জোর-পূর্বক মুসলমান বানানো এবং লুটতরাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকার সংস্থান করা, তেমনি ইসলামের ইতিহাস- ঐতিহ্য এবং সাহাবিদের দীর্ঘদিনের আচার-অভ্যাস ও কাজসমূহ একত্রিত করলে আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে, ইসলামে যেমন নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষামূলক জি/হা*দ ফরজ করা হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যৎ-নিরাপত্তা ও ইসলামপ্রচারের বাধাগুলো দূর করতে আক্রমণাত্মক জি/হা*দও কিয়ামত পর্যন্ত ফরজ করা হয়েছে। আত্মরক্ষামূলক জি/হা*দের উদ্দেশ্য যেমন মানুষকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো নয়, তেমনি আক্রমণাত্মক জি/হা*দের উদ্দেশ্যও কখনো তা হতে পারে না। বিশেষ করে যেখানে উপস্থিত যু/দ্ধ ময়দানেও ইসলাম কা/ফিরদেরকে নিজের আশ্রয়ে স্থান দিতে এবং কু/ফরির ওপর বহাল থাকা সত্ত্বেও তাদের জানমাল ও সম্ভ্রম রক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছে, যেভাবে একজন মুসলমানকে রক্ষা করা হয়ে পৃথিবীতে প্রকৃতশা আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় জি/হা*দই সমান। এ ছাড়া পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা এবং অত্যাচারীদের হাত থেকে দুর্বলদের রক্ষা করা ইত্যাদি, যা জি/হা*দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এতেও উভয় প্রকার জি/হা*দেরই ভূমিকা সমান।

অতএব, সন্দেহের কোনো কারণ নেই যে, ইসলামি ঐতিহ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে আক্রমণাত্মক জি*হা-দ/কে অস্বীকার করতে হবে, যেমনটি আমাদের কোনো কোনো মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ও স্বাধীন চিন্তাবিদরা করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি।

হিজরতের পর জি*হা/দ বা গাজওয়াসমূহের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। সেগুলোর কোনো কোনোটিতে রাসূল (ﷺ) সশরীরে উপস্থিত ছিলেন; আর কোনোটিতে বিশেষ বিশেষ সাহাবির

নেতৃত্বে বাহিনী পাঠিয়েছেন। ইতিহাসবিদদের পরিভাষায় প্রথম প্রকার জি/হা*দকে 'গাজওয়া' এবং দ্বিতীয় প্রকার জি/হা*দকে 'সারিয়া' বলা হয়। গাজওয়ার মোট সংখ্যা ২৩টি। এর মধ্যে ৯টিতে যুদ্ধ হয়েছিল; আর সারিয়ার সংখ্যা ৪৩টি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এসব গাজওয়া ও সারিয়ার মধ্যে মুসলিমদের যু/দ্ধাস্ত্রের অপ্রতুলতা আর সেনা-স্বল্পতা সত্ত্বেও বিজয় সর্বদা তাঁদের পক্ষেই ছিল। অবশ্য উহুদযুদ্ধে প্রথমে বিজয় লাভের পর মুসলমানরা সাময়িকভাবে পরাজিত হন। তা-ও এ জন্য যে, সেনাদের একটি অংশ রাসূল (ﷺ) এর আদেশ পুরোপুরি পালন করেনি।

এসব গাজওয়া ও সারিয়াকে আরও সুস্পষ্ট করে বর্ণনার জন্য আমরা একটি ছকে সনভিত্তিক ধারাবাহিক উল্লেখ করছি। তার মধ্যে শুধু গুরুত্বপূর্ণ গুলো আলোচনা করা হয়েছে।তবে গাজওয়া ও সারিয়াসমূহের তারিখ ও সংখ্যার ব্যাপারে যেহেতু মতভেদ রয়েছে, তাই সেসব মতভেদ পরিহার করে সব বর্ণনায় হাফিজুল হাদিস আল্লামা মুগলতাই রাহ. রচিত সিরাতের ওপরই নির্ভর করেছি।

গাজওয়া ও সারিয়াসমূহ

প্রথম হিজরি

সারিয়া : এ বছর দুটি সারিয়া পাঠানো হয় :
১. সারিয়ায়ে হামজা রা. ও ২. সারিয়ায়ে উবায়দা রা.।

কোনো গাজওয়া সংঘটিত হয়নি।

দ্বিতীয় হিজরি

গাজওয়া : এ বছর পাঁচটি গাজওয়া সংঘটিত হয় :
১. গাজওয়ায়ে আবওয়া। এটাকে গাজওয়ায়ে ওয়াদ্দানও বলা হয়। ২. গাজওয়ায়ে বুওয়াত। ৩. গাজওয়ায়ে বদরে কুবরা। ৪. গাজওয়ায়ে বনি কায়নুকা। ৫. গাজওয়ায়ে সাবিক।

সারিয়া : এ বছর তিনটি সারিয়া পাঠানো হয়: ১. সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ রা.। ২. সারিয়ায়ে উমায়ের রা.। ৩. সারিয়ায়ে সালিম রা.। এ বছরের গাজওয়াসমূহে গাজওয়ায়ে বদরই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় হিজরি গাজওয়া : এ বছর তিনটি গাজওয়া সংঘটিত হয় :

১. গাজওয়ায়ে গাতফান। ২. গাজওয়ায়ে উহুদ। ৩. গাজওয়ায়ে হামরাউল আসাদ।
সারিয়া : এ বছর দুটি সারিয়া পাঠানো হয়: ১. সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা রা.। ২. সারিয়ায়ে জায়েদ ইবনু হারিসা রা.। এ বছরের গাজওয়াসমূহে গাজওয়ায়ে উহুদই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ হিজরি

গাজওয়া: এ বছর দুটি গাজওয়া সংঘটিত হয় :
১. গাজওয়ায়ে বনু নাজির ও ২. গাজওয়ায়ে বদরে সুগরা।

সারিয়া : এ বছর চারটি সারিয়া পাঠানো হয় :
১. সারিয়ায়ে আবু সালামা রা.। ২. সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস রা.। ৩. সারিয়ায়ে মুনজির রা.। ৪. সারিয়ায়ে মারসাদ রা.।

পঞ্চম হিজরি

গাজওয়া : এ বছর চারটি গাজওয়া সংঘটিত হয় :
১. গাজওয়ায়ে জাতুর রিকা। ২. গাজওয়ায়ে দাওমাতুল জানদাল। ৩. গাজওয়ায়ে মুরাইসি। এটাকে গাজওয়ায়ে বনু মুসতালিকও বলা হয়। ৪. গাজওয়ায়ে খন্দক। এ বছরের গাজওয়াসমূহে গাজওয়ায়ে খন্দকই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ষষ্ঠ হিজরি

গাজওয়া : এ বছর তিনটি গাজওয়া সংঘটিত হয় :

১. গাজওয়ায়ে বনু লাহইয়ান, ২. গাজওয়ায়ে গাবাহ, এটাকে গাজওয়ায়ে জি-কারাদও বলা হয়। ৩. গাজওয়ায়ে হুদায়বিয়া।

সারিয়া : এ বছর ১১টি সারিয়া পাঠানো হয়ন:

১. সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা রা., কারতা অভিমুখে। ২. সারিয়ায়ে আক্কাশা। ৩. সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা রা., জিলকুসসা অভিমুখে। ৪. সারিয়ায়ে জায়েদ ইবনু হারিসা রা., বনু সালিম অভিমুখে। ৫. সারিয়ায়ে আবদুর রহমান ইবনু আউফ রা.। ৬. সারিয়ায়ে আলি রা.। ৭. সারিয়ায়ে জায়েদ ইবনু হারিসা রা., উম্মু কারফা অভিমুখে। ৮. সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনু আতিক রা.। ৯. সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা.। ১০. সারিয়ায়ে কুরজ ইবনু জাবির রা.। ১১. সারিয়ায়ে আমর আজ জামরি রা.। এ বছরের গাজওয়াসমূহে গাজওয়ায়ে হুদায়বিয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সপ্তম হিজরি

এ বছর শুধু গাজওয়ায়ে খায়বার সংঘটিত হয় এবং পাঁচটি সারিয়া পাঠানো হয় :

১. সারিয়ায়ে আবু বকর রা.। ২. সারিয়ায়ে বিশর ইবনু সাআদ রা.। ৩. সারিয়ায়ে গালিব ইবনু আবদুল্লাহ রা.। ৪. সারিয়ায়ে বাশির রা.। ৫. সারিয়ায়ে আহজাম রা.।

অষ্টম হিজরি

গাজওয়া : এ বছর চারটি গাজওয়া সংঘটিত হয়ব:

১. গাজওয়ায়ে মুতা। ২. গাজওয়ায়ে ফাতহে মক্কা। ৩. গাজওয়ায়ে হুনাইন। ৪. গাজওয়ায়ে তায়েফ।

সারিয়া : এ বছর ১০টি সারিয়া পাঠানো হয়:

১. সারিয়ায়ে গালিব, বনু মুলাব্বিহ অভিমুখে। ২. সারিয়ায়ে গালিব, ফাদাক অভিমুখে। ৩. সারিয়ায়ে শুজা। ৪. সারিয়ায়ে কাআব। ৫. সারিয়ায়ে আমর ইবনুল আস রা.। ৬. সারিয়ায়ে

আবু উবায়দা রা.। ৭. সারিয়ায়ে আবু কাতাদা রা.। ৮. সারিয়ায়ে খালিদ রা., যাকে গুমাইসাও বলা হয়। ৯. সারিয়ায়ে তুফায়েল ইবনু আমর দাওসি রা.। ১০. সারিয়ায়ে কাতবা রা.।

নবম হিজরি

এ বছর শুধু গাজওয়ায়ে তাবুক সংঘটিত হয়, যা গুরুত্বপূর্ণ গাজওয়াসমূহের একটি। এ ছাড়া তিনটি সারিয়া পাঠানো হয় : ১. সারিয়ায়ে আলকামা। ২. সারিয়ায়ে আলি রা.। ৩. সারিয়ায়ে আক্কাশা রা.।

দশম হিজরি

এ বছর কোনো গাজওয়া সংঘটিত হয়নি, তবে দুটি সারিয়া পাঠানো হয় :

১. সারিয়ায়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা., নাজরান অভিমুখে। ২. সারিয়ায়ে আলি রা., ইয়ামেন অভিমুখে। এ বছরই বিদায়হজ অনুষ্ঠিত হয়।

একাদশ হিজরি

এ বছর রাসূল (ﷺ) উসামা ইবনু জায়েদ রা.-এর নেতৃত্বে একটি মাত্র সারিয়া পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা রাসূল (ﷺ) এর ই/ন্তে*কালের পর রওনা হয়েছিল।

গাজওয়া ও সারিয়া সংখ্যা

১. মোট গাজওয়া ২৩টি, সারিয়া ৪৩টি

উল্লেখ্য, মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদদের পরিভাষায় 'গাজওয়া' ও 'সারিয়া' শব্দ দুটির প্রয়োগ এত সাধারণভাবে করা হয়েছে যে, সামান্য ঘটনাকেও 'গাজওয়া' ও 'সারিয়া' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কোনো অপরাধীকে বন্দি করতে এক-দুজন সাহাবিকে কোথাও পাঠানো হলে ইতিহাসবিদদের পরিভাষায় এটাকেও 'সারিয়া' বলা হতো। এমনিভাবে 'গাজওয়া' শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ইতিহাসবিদরা ব্যাপকতার আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে 'গাজওয়া' ও 'সারিয়া' মোট সংখ্যা উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী ৬৬টি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। নাহয় আমাদের ব্যবহারে

গাজওয়া বলতে গুরুত্বপূর্ণ যেসব যুদ্ধকে বোঝানো হয়, তা মাত্র কয়েকটি। যেগুলোর কিছুটা বিস্তারিত বিবরণসহ পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো।

২. হামজা (রা.) এর নেতৃত্বে প্রথম সারিয়া

হিজরতের সাত মাস পর রমজানে রাসূল (ﷺ) হামজা রা.-কে ৩০ জন মুহাজিরের আমির বানিয়ে সাদা একটি পতাকা হাতে দিয়ে কুরাইশদের এক কাফেলার বিরুদ্ধে পাঠান। তাঁরা যখন সমুদ্র-তীরে পৌঁছে পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন, তখন মাজদি ইবনু আমর জুহানি মধ্যস্থতা করে যুদ্ধ বন্ধ করে দেন।

৩. সারিয়ায়ে উবায়দা ও ইসলামের প্রথম তির নিক্ষেপ

প্রথম হিজরির শাওয়ালে রাসূল (ﷺ) উবায়দা ইবনুল হারিস রা.-কে ৬০ জন লোকের আমির নিযুক্ত করে আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে বাতনে রাগিব অভিমুখে পাঠান। এ যুদ্ধেই সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা. কা/ফিরদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন; আর এটিই ছিল ইসলামের পক্ষ থেকে কা/ফিরদের ওপর ছোড়া প্রথম তীর।

(সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া ﷺ ; পৃষ্ঠা : ৭৫-৮১)

কিবলা পরিবর্তন

এ বছর থেকেই ইসলামের জীবনধারায় এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়- রাসূল (ﷺ) এর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে কাবা শরিফকে মুসলিমদের কিবলা নির্ধারণ করা হয়। কাবা হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম ঘর এবং মানুষ যাতে একদিকে ফিরে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে, এ জন্য এটাকে 'কিবলা' বা সবার মনোযোগের কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়।

সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রা.) ও ইসলামের প্রথম গনিমত

এ বছরই রজবে আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ রা. এর নেতৃত্বে ১২ জন সাহাবির ছোট এক বাহিনীকে নাখলা নামক স্থানে কুরাইশের একটি বাণিজ্যকাফেলার উদ্দেশে পাঠানো হয়। কুরাইশের সেই বাণিজ্য কাফেলা যে দিন আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশের বাহিনীর মুখোমুখি হয়, ঘটনাক্রমে সে দিন ছিল রজবের প্রথম তারিখ; আর রজব হচ্ছে সেই চারটি মাসের একটি, যেসব মাসে ইসলামের প্রথম যুগে হত্যা ও লড়াই হারাম ছিল। তবে সাহাবিরা সে দিনকে মাসের শেষ দিন অর্থাৎ, জামাদিউস সানির ৩০ তারিখ মনে করছিলেন। যেমন: লুবাবুন নুকুল ও তাফসিরে বায়জাবিতে ইবনু জারির, তাবারানি ও বায়হাকি থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে।

৩০ তারিখ ধারণা করে তাঁরা পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত নেন যে, কুরাইশ বাণিজ্যবকাফেলার মোকাবিলা করা হবে। অবশেষে উভয় বাহিনীর মধ্যে লড়াই হয় এবং কুরাইশের কাফেলাবপ্রধান নি/হত হয়। এ ছাড়া দুজন বন্দি হয় এবং অন্যরা পালিয়ে যায়। ফলে মুসলিমরা বিজয়ী হন এবং প্রচুর গনিমত লাভ করেন। আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ রা. গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের জন্য রেখে দিয়ে বাকি অংশ সঙ্গীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

কোনো বর্ণনায় রয়েছে, তিনি গনিমতের সব সম্পদ নিয়ে রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে গেলে রাসূল (ﷺ) তাঁদের বলেন, 'আমি তোমাদের হারাম মাস তথা রজবে যু/দ্ধ করার নির্দেশ দিইনি।' রাসূল (ﷺ) তখন গনিমতের এই সম্পদ রেখে দেন এবং পরে বদরযু/দ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের সঙ্গে মিলিয়ে বণ্টন করেন।

এ ঘটনার পর পুরো আরবে এ কথা ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসূল (ﷺ) নিষিদ্ধ মাসসমূহেও যু/দ্ধ বৈধ করে দিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জবাব হিসেবে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাজিল হয়-

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِير

পবিত্র মাসে যু/দ্ধ করা সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে; বলুন, 'তাতে লড়াই করা বড় পাপ।' [সুরা বাকারা : ২১৭]

গাজওয়ায়ে বদর বা বদরযু/দ্ধ

মদিনা থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরের একটি কূপের নাম বদর। এই কূপের নামে সেখানে একটি গ্রামও রয়েছে। তখনকার দিনে সেখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির বেশ গুরুত্ব ছিল। এখানেই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ হয়।

মদিনায় বইতে থাকা ইসলামি বসন্তের হাওয়া মক্কার কাফিরদের বেশ ভাবিয়ে তুলছিল- না জানি কখন তা দমকা হাওয়ায় রূপ নিয়ে তাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়; কিংবা তাদের ব্যবসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই মুসলিমদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে তারা সর্বদা সচেষ্ট থাকত। মোটকথা, তাদের গর্ব, অহংকার এবং শক্তির উৎস ছিল শামে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য। বিষয়টি মুসলিমরাও আঁচ করতে পেরেছিলেন। ফলে মুসলিমদের জন্য রাজনীতি ও কৌশল হিসেবে কুরাইশদের শক্তির এই উৎস বন্ধ করা জরুরি ছিল।

এ সময় অর্থ সংগ্রহ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনার উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার এক বিশাল বাণিজ্যকাফেলা শামে গিয়েছিল। কুরাইশদের এই বাণিজ্য কাফেলা যখন শাম থেকে ব্যবসা শেষে অস্ত্র নিয়ে ঘরে ফিরছিল, তখন রাসূল (ﷺ) এ সম্পর্কে জানতে পেরে দ্বিতীয় হিজরির ১২ রমজান ৩১৪ জন মুহাজির ও আনসার সাহাবিকে নিয়ে তাদের মোকাবিলায় বেরিয়ে পড়েন। রাওহা নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁরা সেখানে শিবির স্থাপন করেন। কেননা, মুসলিম:বাহিনীর কাছে তখন আত্মরক্ষার্থে হামলা করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। বিষয়টি আবু সুফিয়ান টের পেয়ে রাস্তা ছেড়ে সমুদ্রের উপকূল ধরে কাফেলা নিয়ে এগিয়ে যান। পাশাপাশি তিনি এক অশ্বারোহীকে দ্রুত মক্কার কুরাইশদের কাছে এটা জানাতে পাঠিয়ে দেন যে, কুরাইশরা যেন নিজেদের পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসে এবং কাফেলাকে বিপদমুক্ত করে।

এদিকে কুরাইশরা আগ থেকেই মুসলিমদের মূলোৎপাটন করতে বিভিন্ন বাহানা খুঁজছিল। ফলে সংবাদটি জানার সঙ্গে সঙ্গে আবু জাহলের নেতৃত্বে ৯৫০ জন সশস্ত্র যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী মদিনা আক্রমণের জন্য বের হয়। তাদের সঙ্গে ১০০ ঘোড়া এবং ৭০০ উটও ছিল। এ বাহিনীতে কুরাইশের বড় বড় সকল নেতা অংশ নেয়।

সাহাবিদের আত্মত্যাগ

রাসূল (ﷺ) এ বিষয়ে অবগত হলে তিনি সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এ সময় আবু বকর রা. ও অন্যান্য সাহাবি নিজেদের জানমাল রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে সঁপে দেন। অল্পবয়সি হওয়ায় উমায়ের ইবনু ওয়াক্কাস রা. কে যুদ্ধ অংশ নেওয়া থেকে বারণ করলে তিনি কান্না শুরু করেন। ফলে রাসূল (ﷺ) তাঁকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেন।

[কানজুল উম্মাল]

এদিকে আনসারদের থেকে খাজরাজের সরদার সাআদ ইবনু উবাদা রা. দাঁড়িয়ে বলেন, 'আল্লাহর কসম, আপনি নির্দেশ দিলে আমরা সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।' [সহীহ মুসলিম]

এ ছাড়া সহিহ বুখারির বর্ণনায় রয়েছে, তখন মিকদাদ রা. দাঁড়িয়ে বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার ডানে-বামে, সামনে-পেছনে সব দিক থেকে লড়াই করে যাব।'

রাসূল (ﷺ) তাঁদের এসব কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সামনে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। এরপর সবাই ঐতিহাসিক বদর-প্রান্তরের সন্নিকটে পৌঁছে জানতে পারেন, আবু সুফিয়ান তাঁর বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে এখান থেকে অন্যদিকে চলে গেছেন এবং কুরাইশেরই একটি বিশাল সেনাবাহিনী মাঠের অন্য প্রান্তে শি/বির স্থাপন করেছে। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে চলে যাওয়ার পরও আবু জাহল তার লোকজনকে যু/দ্ধ স্থগিত না করতে কুপরামর্শ দেয়।

মুসলিমরা তাদের এমন মনোভাব বুঝতে পেরে সামনে অগ্রসর হন এবং দেখতে পান, কুরাইশ বাহিনী ময়দানের এমন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে, যেটি যু/দ্ধের জন্য বেশ উপযুক্ত। কেননা, পানির উৎসগুলো সেখানেই ছিল। আর মুসলিম বাহিনী ময়দানের এমন জায়গায় অবস্থান নেয়, যেটি শুষ্ক আর বালুকাময়। এখানে চলাফেরা করাও কঠিন। এ ছাড়া পানিরও কোনো নামগন্ধ ছিল না।

গায়েবি সাহায্য

আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীর জন্য বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি সেভাবেই সবকিছু ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধের আগের দিন বৃষ্টি হয়, ফলে বৃষ্টির পানিতে বালু জমে শক্ত হয়ে যায়। মুসলিম সেনারা তখন তৃপ্তিভরে পানি পান করেন এবং নিজ নিজ পাত্রগুলোতে পানি ভরে রাখেন। অন্যদিকে এই বৃষ্টি কা/ফিরদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। তারা যেখানে অবস্থান করছিল, সে জায়গায় বৃষ্টির পানিতে কাদা জমে পিচ্ছিল হয়ে যায়। হাঁটাচলা করাও তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজান শুক্রবার উভয় পক্ষ চূড়ান্ত যুদ্ধে নাজিল হয়। এ সময় রাসূল (ﷺ) সেনাদের কাতার ঠিক করতে নিজেই দাঁড়িয়ে যান। ফলে মুসলিমবাহ সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে যায়।

মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা

মাত্র ৩০০ নিরস্ত্র মুসলিম সেনা যখন প্রায় ১ হাজার অ/স্ত্র সজ্জিত সেনার মোকাবিলা করছে, এ সময় যদি মাত্র একজন লোকও তাঁদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে, তাহলে সেটা অত্যন্ত উপকারী মনে করা হবে। তবে ইসলামে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এমন কঠিন মুহূর্তে পাওয়া সাহায্য থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। ফলে যখন উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যু/দ্ধ চলছে, তখন হুজায়ফা রা. ও আবু হাসানা রা. যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রণাঙ্গণে এসে উপস্থিত হন। এ সময় তাঁরা রাস্তায় ঘটে যাওয়া ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'কা/ফিররা রাস্তায় আমাদের আটক করেছিল। তখন তারা আমাদের জিজ্ঞেস করে, "তোমরা কি মুহাম্মাদকে সাহায্য করতে যাচ্ছ?” আমরা তা অস্বীকার করি এবং যুদ্ধে অংশ নেব না বলে প্রতিশ্রুতি দিই।' রাসূল (ﷺ) যখন তাঁদের এমন প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তিনি যু/দ্ধে অংশগ্রহণ থেকে তাঁদের বিরত রাখেন এবং বলেন, 'আমরা সর্বাবস্থায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট।'

[সহীহ মুসলিম]

এরপর মুসলিম সেনাদের কাতার সোজা করা হলে তখনকার রীতি অনুযায়ী দ্বন্দ্ব যু/দ্ধের মাধ্যমে লড়াই শুরু হয়। কুরাইশদের থেকে তিনজন বীর-উতবা ইবনু রাবিআ, শায়বা ইবনু রাবিআ ও ওয়ালিদ ইবনু উতবা লড়াইয়ের জন্য সামনে আসে; আর মুসলিমদের থেকে হামজা ইবনু আবদুল মুত্তালিব রা., উবায়দা ইবনু হারিস রা. ও আলি ইবনু আবি তালিব রা. তাদের মোকাবিলা করেন। কুরাইশের পক্ষের তিনজনই নিহত হয়। মুসলিমদের শুধু উবায়দা রা. আহত হন। আলি রা. তখন তাঁকে কাঁধে করে রাসূল (ﷺ) এর কাছে নিয়ে আসেন। রাসূল (ﷺ) তাঁকে নিজের উরুতে শুইয়ে দিয়ে তাঁর চেহারা থেকে ধুলোবালি নিজ হাতে পরিষ্কার করে দেন। এ সম্পর্কে কবি বলেন,

বন্ধু আমার আঁচল দিয়ে মুছে দিচ্ছেন অশ্রু
আজকের কান্নায় তাই আছে আনন্দের কারণ।

উবায়দা রা. শাহাদাত-মুহূর্তে রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমি কি শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম?' রাসূল (ﷺ) বলেন, 'না, তুমি নিশ্চয় শ/হিদ এবং আমি নিজেই এর সাক্ষী।' রাসূল (ﷺ) এর মুখে এ কথা শুনে উবায়দা রা. অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলতে থাকেন, 'আজ যদি আবু তালিব বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁকে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হতো যে, আমিই হলাম তাঁর কবিতার উপযুক্ত ব্যক্তি।

এরপর উবায়দা রা. ই/ন্তে*কাল করলে খোদ রাসূল (ﷺ) তাঁর কবরে নামেন এবং নিজ হাতে তাঁকে দাফন করেন। সাহাবিদের মধ্যে বিশেষ এই মর্যাদা কেবল উবায়দা রা.-এর ভাগ্যেই জুটেছিল।

যুদ্ধে সাহাবিদের বিস্ময়কর আত্মত্যাগ

বদরের ময়দানে কাফির ও মুসলিম বাহিনী যখন মুখোমুখি হয়, তখন এমন পরিস্থিতিও দেখা যায় যে, নিজেদের অনেক আত্মীয়-স্বজন আর কলিজার টুকরো আপনজন তরবারির নিচে এসে গেছেন; কিন্তু আল্লাহর বাহিনীর তখন এ বিশ্বাস ছিল যে,
হাজারো আত্মীয় হয়ে গেছে আল্লাহ বিমুখ,
তারা কেউই এখন আর আমার আত্মীয় নয়

আল্লাহর তরে নিজেদের সঁপে দেয় যাঁরা,
শুধু তাঁরাই আমার আত্মীয় হয়।

সুতরাং আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর ছেলে-যিনি তখনো মুসলমান হননি—যখন যুদ্ধ মাঠে নেমে আসেন, তখন খোদ আবু বকর রা. এর তরবারি তার দিকে এগিয়ে যায়। এদিকে উতবা যখন ছেলে হুজায়ফা রা. এর সামনে পড়ে, তখন ছেলে হয়েও তিনি পিতার দিকে ত/রবারি কোষমুক্ত করে এগিয়ে যান। উমর রা. এর তরবারি তো তাঁর আপন মামার পরিণতির মীমাংসা করে দেয়।

এরপর তুমুল লড়াই শুরু হয়। যুদ্ধ ময়দানে তখন ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এমন সময় রাসূল (ﷺ) সিজদায় পড়ে যান এবং আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দুআ করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে সাহায্যের ঘোষণা দিলে তিনি আশ্বস্ত হন।

আবু জাহেলকে হ/ত্যা

আবু জাহেলের অপকর্ম এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তার শত্রুতা সম্পর্কে সবাই জানতেন, ফলে আনসারদের মধ্যে কিশোর মুআজ রা. ও মুআওয়িজ রা. নামের দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাঁরা যখনই তাকে দেখবেন, তখনই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হ/ত্যা করবেন অথবা নিজেরা শহিদ হয়ে যাবেন।

বদরের যুদ্ধকে সুযোগ মনে করে নিজেদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে দুই ভাই বের হন; কিন্তু তাঁরা আবু জাহেলকে কখনো দেখেননি, তাই তাকে চিনতেন না। তাঁরা আবদুর রাহমান ইবনু আউফ রা. কে জিজ্ঞেস করেন, 'আবু জাহেল লোকটা কে?' আবদুর রাহমান ইবনু আউফ রা. তখন ইশারায় তাকে দেখিয়ে দেন। আবু জাহেলকে দেখা মাত্রই তাঁরা বাজপাখির মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই কা/ফির সরদার আবু জাহেল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

এ সময় আবু জাহেলের পাশেই যু/দ্ধ করছিলেন তার ছেলে ইকরিমা রা.। তিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি পিতার এই করুণ দশা দেখে প্রথমে ভড়কে যান। এরপর পেছন দিক থেকে এসে মুআজ রা.-এর বাহুতে তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করেন। ফলে তাঁর হাতটি

কে/টে যায় এবং শরীর থেকে আলাদা হয়ে চামড়ার সামান্য অংশে ঝুলে থাকে। এ অবস্থায়ই তিনি ইকরিমার পিছু ধাওয়া করেন; কিন্তু ইকরিমা দৌড়ে পালিয়ে যান।

মুআজ রা.-এর কর্তিত হাতটি তখনো ঝুলে ছিল এবং এতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছিল, এ জন্য তিনি সে হাতটি পায়ের নিচে রেখে এক টানে ছিঁড়ে ফেলেন। তারপর ছিঁড়ে ফেলা হাত দূরে নিক্ষেপ করে আবারও যু/দ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

[সিরাতে হাবলিয়া]

একমুঠো পাথরকণা দিয়ে শত্রুদের পরাজিত করা এবং ফেরেশতাদের সাহায্য

আল্লাহ তাআলার আদেশে রাসূল (ﷺ) একমুঠো মাটি বা পাথর নিয়ে শত্রুদের প্রতি ছুড়ে মারেন এবং সাহাবিদের নির্দেশ দেন, 'একযোগে তোমরা তাদের ওপর হামলা চালাও।' এদিকে রাসূল (ﷺ) এর নিক্ষিপ্ত পাথর তাদের সবার চোখে বিশ্ব হয়।

রাসূল (ﷺ) এর নির্দেশ পেয়েই সাহাবিদের ছোট এই বাহিনী কাফিরদের দিকে এগিয়ে যায়। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন।

এ যুদ্ধে কুরাইশদের বড় বড় অনেক নেতা নিহত হয়। এতে করে মুশরিক সেনাদের মনোবল ভেঙে যায় এবং পরাজিত হয়ে তারা যুদ্ধের মাঠ থেকে পালায়। মুসলিমরা তখন শত্রু বাহিনীর পিছু ধাওয়া করে অনেককে হত্যা এবং অনেককে বন্দি করেন। এভাবে কাফিরদের ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দি হয়। নিহতের মধ্যে কুরাইশের নেতা আবু জাহল, উমাইয়া ইবনু খালফ, শায়বা ইবনু রাবিআ, তার ভাই উতবা এবং তার ছেলে ওয়ালিদ ইবনু উতবা গং ছিল। অপরদিকে মুসলিমদের মধ্যে মাত্র ১৪ জন শহিদ হন। তাঁদের মধ্যে ছয়জন মুহাজির ও আটজন আনসার সাহাবি ছিলেন।

উল্লেখ্য, এ যুদ্ধ বা গাজওয়া মূলত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে প্রকাশ্য একটি মুজিজা। এমন না হলে এই অসম যুদ্ধে অল্পসংখ্যক মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। মাত্র ৩১৪ জন নিরস্ত্র মুসলমানের মোকাবিলায় কুরাইশের ১ হাজার সশস্ত্র

সেনার বিশাল বাহিনীর পরাজয় বিস্ময়ের অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কেননা, বিপক্ষদলে নেতৃস্থানীয় বিত্তশালী এমন অনেক লোক ছিল, যাদের একেকজন পুরো বাহিনীর খাবার ও অন্যান্য খরচ বহনের সক্ষমতা রাখত। আর তাদের মোকাবিলায় ছিল অস্ত্র ও সহায়-সম্বলহীন সামান্য কিছু মুসলমান। এদিকে কা/ফির বাহিনীতে ছিল ১০০ অশ্বারোহী; আর মুসলিম বাহিনীতে ছিল মাত্র দুটি ঘোড়া! কুরাইশদের কাছে ছিল বিশাল অস্ত্র ভান্ডার; আর মুসলিম বাহিনীতে হাতে গোনা কয়েকটি তরবারি।

এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে যেসব বিষয় প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছিল, তা ছিল নাখলার খণ্ডযুদ্ধ, কাফিরদের রণপ্রস্তুতি, আবু সুফিয়ানের অপপ্রচার, যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য ওহি লাভ, মক্কাবাসীর ক্ষোভ ইত্যাদি। আর পরোক্ষ কারণ হিসেবে দেখা হয়, মদিনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কুরাইশদের হিংসা, আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও ইয়াহুদিদের ষড়যন্ত্র, কুরাইশদের যুদ্ধের হুমকি, তাদের ব্যবসা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা, কাফিরদের আক্রান্ত হওয়ার ভয়, ইসলামের ক্রম-বর্ধমান শক্তির ধ্বংস এবং রাসূল (ﷺ)-কে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার কাফিরদের অশুভ মনস্কামনা।

এ ছাড়া বদরযুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর বিজয় কুরাইশদের অবাধ বাণিজ্য এবং আরবের অন্যান্য গোত্রের ওপর অন্যায় প্রভাব খাটানোর পথ বন্ধ করে দেয়। মদিনার উপকণ্ঠে ডাকাতি ও লুণ্ঠনের যে ধারা যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল, যার পেছনে কুরাইশ-নেতাদের সহযোগিতা ও প্রশ্রয় ছিল, তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মুসলিম বাহিনীর এই বিজয়ে স্বস্তি প্রকাশ করে মদিনা ও আশপাশের সর্বস্তরের মানুষ। তারা স্বাগত জানায় সত্য পক্ষের এই মহান বিজয়কে।

ইউরোপীয় ইতিহাসবিদরা বদরের এই যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্ময়বোধ করে যে, এটা কীভাবে সম্ভব হলো? তারা তো জানে না, যুদ্ধে জয়-পরাজয় এবং সফলতা-ব্যর্থতা ঘোড়া, অস্ত্র, তীর-ত/রবারি বা রসদ নির্ভর নয়; বরং তাতে অন্য কারও হাত থাকে। কিন্তু বাহ্যিক অবস্থায় বিশ্বাসী এবং আগুন ও বাতাসের পূ*জারিরা বিজয়ের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কীভাবে জ্ঞান লাভ করবে?

বদরের যু/দ্ধ বন্দিদের সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ এবং সভ্যতার দাবিদার ইউরোপীয়দের জন্য শিক্ষা

বদরের যুদ্ধ বন্দিরা মদিনায় পৌঁছার পর রাসূল (ﷺ) সাহাবিদের মধ্যে সেই বন্দিদের ভাগ করে দেন। পাশাপাশি সবাইকে নির্দেশ দেন, তাঁরা যেন বন্দিদের যথাযথ সেবাযত্ন করেন। ফলে সাহাবিরা তাদের ভালো খাবার খাওয়াতেন, আরামে রাখতেন; আর নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে দিন পার করতেন।

মুসআব ইবনু উমায়ের রা.-এর ভাই আবদুল আজিজও যুদ্ধবন্দি ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমাকে যে আনসার সাহাবির দায়িত্বে দেওয়া হয়েছিল, তিনি যখন খাবার নিয়ে আসতেন, তখন আমার সামনে রুটি রেখে দিতেন এবং তিনি শুধু খেজুর খেয়ে দিন পার করতেন।'

যুদ্ধ শেষে রাসূল (ﷺ) মদিনায় পৌঁছার পর সাহাবিদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্দিদের ব্যাপারে পরামর্শ করেন। তখন এ সিদ্ধান্ত হয় যে, মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। ফলে ৪ হাজার দিরহাম করে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

ইসলামি সাম্য

যুদ্ধ বন্দিদের মধ্যে রাসূল (ﷺ) এর সম্মানিত চাচা আব্বাস রা. ও ছিলেন। তিনি পরবর্তী সময়ে মুসলমান হন। আব্বাস রা. রাত হলে তাঁর এই বন্দিদশার কারণে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর এই যন্ত্রণাকাতর আওয়াজ রাসূল (ﷺ) এর কানে পৌঁছতেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। সকাল হলে সাহাবিরা জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি রাতে ঘুমাননি কেন?' রাসূল (ﷺ) বলেন, 'আমি কীভাবে ঘুমাই; অথচ আমার সম্মানিত চাচার কষ্টের আওয়াজ আমার কানে আসছে?'

ইসলাম কিন্তু এ সুযোগ দেয়নি যে, নিজের সম্মানিত ও বৃদ্ধ চাচাকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসেবে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করা যাবে। অন্যান্য বন্দিদের কাছ থেকে যে পরিমাণ মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছে, তাঁর থেকেও তা-ই আদায় করা হয়েছে; বরং সাধারণ বন্দিদের থেকে একটু বেশিই নেওয়া হয়েছে তাঁর কাছ থেকে। কেননা, সাধারণ বন্দিদের থেকে ৪ হাজার দিরহাম এবং ধনী ও নেতৃপর্যায়ের বন্দিদের থেকে কিছু বেশি নেওয়া হয়েছে। আব্বাস রা. ছিলেন

ধনিকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, তাই তাঁকে ৪ হাজার দিরহাম থেকে কিছু বেশি দিতে হয়েছিল। এ সময় আনসার সাহাবিরা রাসূল (ﷺ) এর কাছে আবেদন করেন, আব্বাস রা. এর মুক্তিপণ যেন ক্ষমা করা হয়। কিন্তু ইসলামি সাম্যে আত্মীয়-অনাত্মীয়, শত্রু ও বন্ধু সবাই সমান। এ জন্য অনেক বলার পরও আনসারদের এই আবেদন গৃহীত হয়নি।

ঠিক এভাবেই রাসূল (ﷺ) এর জামাতা আবুল আসও যু/দ্ধবন্দি ছিলেন। তাঁর কাছে মুক্তিপণ দেওয়ার মতো কিছু ছিল না। তখন তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ, রাসূল (ﷺ) কন্যা জায়নাব রা. এর কাছে তিনি সংবাদ পাঠান, তিনি যেন মুক্তিপণের অর্থ পাঠিয়ে দেন। কেননা, তিনি তখন মক্কায় ছিলেন। জায়নাব রা.-এর গলায় একটি হার ছিল। এটি তাঁর মা খাদিজা রা. তাঁর বিয়ের সময় উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। জায়নাব গলা থেকে সেটি খুলে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। রাসূল (ﷺ) এর সামনে যখন হারটি উপস্থাপন করা হয়, তখন তিনি সেটি দেখে কেঁদে ফেলেন। তিনি সাহাবিদের বলেন, 'এটি জায়নাবের মায়ের স্মৃতিচিহ্ন। যদি তোমরা সম্মত হও, তাহলে হারটি তাঁর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও।' সাহাবিরা রাসূল (ﷺ) এর এই প্রস্তাব খুশিমনে মেনে নেন। এরপর রাসূল (ﷺ) আবুল আসকে এই শর্তে ছেড়ে দেন যে, তিনি জায়নাবকে মদিনায় পাঠিয়ে দেবেন। [মিশকাতুল মাসাবিহ]

বন্দিদের সঙ্গে সদাচার

বদরের যু/দ্ধ বন্দিদের কাছে পরার মতো কাপড় ছিল না, তাই রাসূল (ﷺ) তাদের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করেন। এদিকে যু/দ্ধ বন্দি রাসূল (ﷺ) এর সম্মানিত চাচা আব্বাস রা. এতটাই লম্বা আকৃতির ছিলেন যে, কোনো জামাই তাঁর শরীরে খাপ খাচ্ছিল না। তখন মু/নাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই তার জামাটি আব্বাসকে দিয়ে দেয়। এরপর রাসূল (ﷺ) তাঁর একটি জামা আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে দিয়েছিলেন, এটাকে মূলত সেই উপকারের প্রতিদান গণ্য করা হয়। [সহীহ বুখারী]

আবুল আস (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ

রাসূল (ﷺ) জামাতা আবুল আস মুক্তিলাভের পর মক্কা ফিরে গিয়েই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্ত্রী জায়নাব রা. কে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আস বড় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ঘটনাক্রমে

দ্বিতীয়বার শাম থেকে ব্যবসা-পণ্য নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে মুসলিমদের হাতে বন্দি হন এবং এবারও তাঁকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়বারের মতো মুক্তি পেয়ে তিনি মক্কায় চলে যান এবং সকল অংশীদারের মাল তাদের বুঝিয়ে দিয়ে মুসলমান হয়ে যান। এরপর তিনি লোকদের বলেন, 'আমার কাছে তোমাদের আর কোনো পাওনা আছে?' জবাবে তারা বলে, 'না, আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দিন। আমরা তোমাকে চমৎকার প্রতিশ্রুতি পালনকারী হিসেবে পেয়েছি।' আবুল আস বলেন, 'আমি তোমাদের হক পূর্ণরূপে আদায় করেছি। এখন আমি ঘোষণা দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।' মদিনায় অবস্থানকালে আমি এ ঘোষণা দিতে পারতাম; কিন্তু এ জন্য দিইনি যে, তোমরা তখন ধারণা করতে, আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই এমনটি করেছি; অথবা আমাকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হয়েছে।' আল্লাহ যখন আমাকে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তখনই আমি ইসলামের ঘোষণা দিচ্ছি।(১৪০) এরপর আবুল আস রা. মদিনায় রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে হাজির হন। রাসূল (ﷺ) তাঁকে সসম্মানে বরণ করেন এবং স্ত্রী জায়নাব রা. কেও তাঁর হাতে তুলে দেন। আবুল আস রা. ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি। আবু বকর রা. এর খিলাফতকালে ১২ হিজরির জিলহজে তিনি ই/ন্তেকাল করেন।

শিক্ষার বিনিময়ে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি

বদরের যু/দ্ধে যে-সকল বন্দি মুক্তিপণ আদায় করতে সক্ষম ছিল না, ১০ জন মুসলিম শিশুকে লেখাপড়া শেখানোর শর্তে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। এ ঘটনা ছিল যুদ্ধ ও শিক্ষার ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত। জায়েদ ইবনু সাবিত রা. এভাবে লেখাপড়া শিখেছিলেন। বদর যু/দ্ধে বিজয়ের পথ ধরেই পরবর্তীকালে মুসলিমরা অপ্রতিরোধ্য গতিতে দ্রুত সময়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন।

দ্বিতীয় হিজরির বিভিন্ন ঘটনা

এ বছর রবিবার রাসূল (ﷺ) যখন বদরের যু/দ্ধ থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন লোকজন রাসূল (ﷺ) এর কন্যা রুকাইয়া রা.-এর দাফন শেষ করে হাতের মাটি ঝাড়ছিল।

এ বছরই বদর যু/দ্ধ থেকে ফেরার পর প্রথম ইদুল ফিতরের নামাজ আদায় করা হয়। রমজানের রোজা ও জাকাত এ বছরই ফরজ হয়। এ ছাড়া সাদাকাতুল ফিতর, ইদুল আজহার নামাজ ও কুরবানি ওয়াজিব হয়। [সিরাতে মুগলতাই]

এ বছরের জিলহজে আলি রা.-এর সঙ্গে রাসূল (ﷺ) এর কন্যা ফাতিমা রা.-এর বিয়ে হয়।

গাজওয়ায়ে উহুদ ও গাতফান

গাতফান যু/দ্ধ ও রাসূল (ﷺ) এর মুজিজা

তৃতীয় হিজরিতে দাসুর ইবনু হারিস মুহারিবি নামের এক ব্যক্তি ৪৫০ জন সেনা নিয়ে মদিনায় আক্রমণ করতে আসছে, এমন সংবাদ পেয়ে রাসূল (ﷺ) তাদের প্রতিহত করতে মদিনার বাইরে আসেন। তখন শত্রুসেনারা পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় নেয়। রাসূল (ﷺ) ময়দানে কাউকে না পেয়ে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যান।

এ সময় একটি ঘটনা ঘটে। বৃষ্টিতে রাসূল (ﷺ) এর জামা ভিজে যায়। তিনি জামাটি শরীর থেকে খুলে একটি গাছের ডালে শুকাতে দেন এবং নিজে সেই গাছের নিচে শুয়ে পড়েন। এদিকে দাসুর পাহাড় থেকে এ দৃশ্য দেখছিল। সে যখন দেখে, রাসূল (ﷺ) নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন সোজা তাঁর মাথার সামনে এসে তরবারি উচিয়ে ধরে বলে, 'এবার আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?' রাসূল (ﷺ) ভয়হীন কণ্ঠে উত্তর দেন, 'আল্লাহ।' রাসূল (ﷺ) এর এই উত্তর দাসুরের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। ফলে তার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ে। এবার রাসূল (ﷺ) তরবারি হাতে নিয়ে পালটা প্রশ্ন করেন, 'বলো তো, এবার আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?' সে তখন নিথর দাঁড়িয়ে থাকে। এ ছাড়া তো তার কোনো উপায়ও ছিল না। তার এই অবস্থায় রাসূল (ﷺ) এর মনে করুণা জাগে। তিনি দাসুরকে ক্ষমা করে দেন।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দাসুরকে এতটাই আচ্ছন্ন করে যে, দাসুর একাই শুধু ইমান আনেননি; বরং তাঁর পুরো গোত্রে তিনি ইসলামের প্রচারক বনে যান।

যদিও এই রণ প্রস্তুতি যু/দ্ধ পর্যন্ত গড়ায়নি, তবু এটি গাজওয়া হিসেবে বিবেচিত। এই গাজওয়ার নাম গাতফান।

রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে হাফসা (রা.) ও জায়নাব (রা.) এর বিয়ে

তৃতীয় হিজরির শাবানে উম্মুল মুমিনিন হাফসা রা. এবং রমজানে জায়নাব বিনতু খুজাইমা রা. রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবন্ধ হন।

গাজওয়ায়ে উহুদ বা উহুদ যু/দ্ধ

উহুদ মদিনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরের একটি পাহাড়ের নাম। সেখানে হারুন আ.- এর কবর রয়েছে। সবার ঐকমত্যে উহুদের যু/দ্ধ তৃতীয় হিজরির শাওয়ালে সংঘটিত হয়। তবে ইতিহাসবিদদের মতে, এর নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন : ৭, ৯, ১০ ও ১১ শাওয়াল।

বদর যু/দ্ধে মক্কার মুশরিকদের পরাজয় ও অপমানের গ্লানি এবং সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের হ/ত্যার ফলে দুঃখের বোঝা তাদের বহন করতে হচ্ছিল। এই শোক, ক্ষোভ- দুঃখ নিয়ে যদিও তারা একটি বছর পার করেছে; কিন্তু মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ হচ্ছিল। এমনকি তাদের নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করতেও লোকদের নিষেধ করে দিয়েছিল। এ পর্যায়ে তারা যু/দ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ৩ হাজার সেনার বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ৭০০ বর্ম, ২০০ ঘোড়া এবং ৩ হাজার উট ছিল। এমনকি ১৪ জন মহিলাকে তারা এ জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল যে, এরা তাদের পুরুষদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলবে এবং যারা পালাতে চায়, এরা তাদের তিরস্কার ও লজ্জা দেবে।

এদিকে রাসূল (ﷺ) এর চাচা আব্বাস রা. যিনি এ সময় ইসলাম কবুল করে নিয়েছেন, তবে তখনো মক্কাতেই ছিলেন-কুরাইশদের এমন আয়োজন ও যু/দ্ধ প্রস্তুতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং এতে তিনি অত্যন্ত বিচলিতবোধ করেন। এ জন্য তিনি এর

বিস্তারিত সংবাদ জানিয়ে চিঠিসহ দ্রুতগামী একজন দূতকে মদিনায় রাসূল (ﷺ) এর কাছে পাঠিয়ে দেন।

রাসূল (ﷺ) এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোককে সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠান। তাঁরা ফিরে এসে তাঁকে সংবাদ দেন যে, কুরাইশরা মদিনার উপকণ্ঠে এসে গেছে। যেহেতু মদিনা শহরে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, তাই শহরের চারদিকেই পাহারার ব্যবস্থ্য করা হয়। সকালে রাসূল (ﷺ) সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এরপর ১ হাজার সেনার এক বাহিনী নিয়ে মদিনার বাইরে চলে আসেন। এ বাহিনীতে মু/নাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সমমনা ৩০০ মুনাফিকও ছিল। তবে তারা পথিমধ্যেই বাহিনী ছেড়ে ফিরে আসে। ফলে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা কমে ৭০০ জনে দাঁড়ায়।

সেনা বিন্যাস ও সাহাবি-সন্তানদের জি/হা*দি স্পৃহা

মদিনা থেকে বেরোনোর পর মুজাহিদের যখন চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই করা হয়, তখন অল্পবয়সি কিশোর মুজাহিদদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এ-সকল কিশোরের অন্তরে জি/হা*দের প্রতি আন্তরিকতা ও স্পৃহা ছিল অতুলনীয়। রাফি ইবনু খাদিজ রা. কে যখন বলা হয়, 'তোমার বয়স কম, তুমি মদিনায় ফিরে যাও।' তখন তিনি পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ান, যেন তাঁকে লম্বা ও উঁচু মনে করা হয়। তাঁর আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাহিনীতে যুক্ত করা হয়। এ ছাড়া সামুরা ইবনু জুনদুব রা.- যিনি রাফি ইবনু খাদিজ রা. এর সমবয়সি ছিলেন- তিনি যখন এ ঘটনা দেখেন, তখন রাসূল (ﷺ) এর কাছে আবেদন করেন, 'আমি তো রাফিকে মল্লযু*দ্ধে পরান্ত করে থাকি। তাঁকে যদি যু/দ্ধের জন্য মনোনীত করা হয়, তাহলে তো আমাকে আরও আগেই নেওয়া উচিত!' তাঁর কথামতো রাফি রা. ও সামুরা রা. কে কুস্তিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। কুস্তিতে সামুরা রা. রাফি ইবনু খাদিজ রা. কে পরাস্ত করেন। ফলে তাঁকেও বাহিনীতে যুক্ত করা হয়।
[তারিখুত তাবারি]

যারা বলে, 'ইসলাম তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে' তারা কি এসব আত্মত্যাগের ঘটনা দেখেও নিজেদের মিথ্যা কথার কারণে লজ্জিত হবে না?

এরপর উহুদের ময়দানে পৌঁছে রাসূল (ﷺ) মুজাহিদদের বিন্যাস করে কাতারবন্দি করে দাঁড় করান। উহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে যু/দ্ধের কৌশল ঠিক করেন। কেননা, এ দিক দিয়ে শত্রুদের এগিয়ে আসার আশঙ্কা ছিল। ফলে এই কৌশল একদিকে ছিল ঝুঁকিপূর্ণ আবার অন্যদিকে সুবিধাজনক বটে। উহুদের পেছন দিক থেকে এক জায়গা দিয়ে হামলার আশঙ্কা ছিল, এ জন্য রাসূল (ﷺ) সেখানে ৫০ জনের এক তিরন্দাজ বাহিনীকে পাহারার দায়িত্ব দিয়ে কঠোরভাবে তাঁদের নির্দেশ দেন, 'মুসলিমদের জয়-পরাজয় যা-ই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় তোমরা এখানে অটল থাকবে।'

এরপর যু/দ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ যু/দ্ধের পর মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের পিছু হটাতে সক্ষম হয়। এ পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হিসেবে যু/দ্ধ ময়দানে অবস্থান করে; আর কুরাইশরা মনোবল হারিয়ে এদিকে-সেদিক পালাতে থাকে। মুসলিম সেনারা তখন যুদ্ধ ময়দানে গনিমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ দৃশ্য দেখে পাহাড়ের ওই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাসূল (ﷺ) যে ৫০ জন সেনাকে পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ফলে তাঁদের অনেকে মুসলিমদের বিজয় হয়েছে মনে করে নিশ্চিন্ত মনে সেখান থেকে চলে আসেন। তবে তাঁদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা. বার বার নিষেধ করছিলেন; কিন্তু তাঁরা তাঁদের নেতার কথা মানেননি। তবে এরপরও কয়েকজন সেখানে থেকে যান।

এ জায়গাটি প্রায় ফাঁকা দেখে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.- যিনি তখনো মুসলমান হননি এবং কুরাইশের পক্ষে যু/দ্ধ করছিলেন- পেছন দিক থেকে আচমকা আক্রমণ করে যু/দ্ধের দৃশ্য। পালটে দেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা. সহ তাঁর সঙ্গে থাকা অল্প কয়েকজন সাহাবি প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যান, তবে শেষ পর্যন্ত সবাই শাহাদত বরণ করেন।

এবার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. তাঁর বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুসলমান ও কা/ফির উভয় বাহিনী তখন যু/দ্ধ ময়দানে এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় যে, মুসলমান মুসলমানের হাতেই নিহত হতে থাকেন।

এ যু/দ্ধে মুসআব ইবনু উমায়ের রা. শহিদ হন। তাঁর চেহারার সঙ্গে রাসূল (ﷺ) এর চেহারার অনেক মিল ছিল। ফলে তাঁর শাহাদাতের পর গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসূল (ﷺ) শ/হিদ হয়েছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, শ/য়তান বা মু/শরিকদের কেউ একজন উচ্চঃস্বরে এ ঘোষণা দেয় যে, 'মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন। '

এই মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিদের মনোবল ভেঙে যায়। এমনকি বড় বড় অনেক সাহাবিও হতাশ হয়ে যান। তবে অনেকে তখনো অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যু/দ্ধ চালিয়ে যান। বিশৃঙ্খলার কারণে মুসলিমদের হাতে মুসলিমরা শহিদ হতে থাকেন। তবে সবার দৃষ্টি তখন রাসূল (ﷺ) কে খুঁজে ফিরছিল। এরপর কাআব ইবনু মালিক রা. প্রথমে তাঁকে দেখতে পান। তিনি আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার দিয়ে ওঠেন, 'মুবারক হো, রাসূল (ﷺ) নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।'

কাআব ইবনু মালিক রা. এর আওয়াজ যখন সাহাবিরা শুনতে পান, তখন সবাই রাসূল (ﷺ) এর কাছে দৌড়ে আসতে থাকেন। এ সময় কা/ফিররা অন্য দিক থেকে সরে এসে এদিকে মনোনিবেশ করে। তারা কয়েকবার রাসূল (ﷺ) এর ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তবে তিনি নিরাপদই থাকেন। এমনকি কা/ফিররা একবার কঠোর আক্রমণ করলে তিনি সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'কে আছে এমন, যে আমার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত?' তখন জিয়াদ ইবনু সাকান রা. নিজের চার সঙ্গীসহ তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন। তাঁরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত সবাই শ/হিদ হন। জিয়াদ রা. যখন আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান, তখন রাসূল (ﷺ) বলেন, 'তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' সাহাবিরা তাঁকে পাঁজাকোলা করে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। তখনো তাঁর প্রাণ বাকি ছিল। জিয়াদ রা. রাসূল (ﷺ) এর পায়ের ওপর নিজের মুখ রাখেন এবং এ অবস্থায়ই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

রাসূল (ﷺ) এর চেহারা মুবারক আহত হওয়া

কুরাইশদের প্রখ্যাত বীর আবদুল্লাহ ইবনু কুমাইয়া সেনাদের সারি ভেদ করে সামনে এগিয়ে যায় এবং রাসূল (ﷺ) এর চেহারা মুবারকে ত/রবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করে। ফলে রাসূল (ﷺ) এর মাথায় পরিহিত শিরস্ত্রাণের (লোহার টুপি) দুটি কড়া মুখ ভেদ করে ঢুকে যায় এবং একটি দাঁত শহিদ হয়। তখন আবু বকর রা. শিরস্ত্রাণের কড়া দুটি ক্ষতস্থান থেকে ওঠাতে এগিয়ে এলে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. বলেন, 'আল্লাহর কসম, এ খিদমতটি আমাকে করার সুযোগ দিন।' তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে হাত না লাগিয়ে নিজের মুখ দিয়ে সেই কড়া দুটিতে টান দেন। এতে করে যদিও একটি কড়া বেরিয়ে আসে; কিন্তু এর সঙ্গে আবু উবায়দা রা. এর একটি দাঁতও উপড়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে আবু বকর রা. দ্বিতীয় কড়াটি বের করতে সামনে এগিয়ে এলে তখন আবু উবায়দা রা. আবারও কসম দিয়ে তাঁকে বিরত

রাখেন এবং নিজেই তাতে মুখ লাগিয়ে টান দেন। এবারও তাঁর আরেকটি দাঁত উঠে আসে! [ইবনু হিব্বান]

এ সময় কা/ফিরদের তৈরি একটি গর্তে রাসূল (ﷺ) পড়ে যান। মুসলিমদের ভূপাতিত করতেই তারা এটা খুঁড়েছিল।

সাহাবিদের আত্মত্যাগ

এ অবস্থা দেখে প্রাণোৎসর্গকারী সাহাবিরা রাসূল (ﷺ) কে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ান। তখন তরবারির ঝনঝনানি ও তীরবৃষ্টি হচ্ছিল। সাহাবিরা ঢাল হিসেবে দাঁড়িয়ে সেগুলো নিজেদের শরীরে বিদ্ধ করতে থাকেন। আবু দুজানা রা. তো নিজেকে রাসূল (ﷺ) এর ঢাল বানিয়ে রাখেন। এদিকে কা/ফিরদের নিক্ষিপ্ত তীরগুলো তাঁর শরীরে বিদ্ধ হতে থাকে। তালহা রা.ও তীর-তরবারির আঘাতগুলো নিজের শরীর দিয়ে প্রতিহত করছিলেন। ফলে তাঁর একটি হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। [সহীহ বুখারী]

যু/দ্ধ শেষে হিসাব করে দেখা যায়, তালহা রা. এর শরীরে ৭০টিরও বেশ আঘাত রয়েছে! [ইবনু হিব্বান]

আবু তালহা রা. একটি ঢালের মাধ্যমে রাসূল (ﷺ) কে হিফাজত করছিলেন। রাসূল (ﷺ) যখনই ঘাড় উচিয়ে সেনাদের দিকে তাকাতেন, তখন আবু তালহা রা. বলতেন, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি মাথা ওঠাবেন না। শত্রুরা নিপাত যাক। আপনার শরীরে যাতে কোনো তীর না লাগে, এ জন্য আপনার আগে আমার বুক প্রস্তুত রয়েছে।'

এ সময় এক সাহাবি এসে রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহর রাসুল, যুদ্ধে যদি আমি নিহত হই, তাহলে অবস্থান কোথায় হবে?' তিনি বলেন, 'জান্নাত।' এই সাহাবির হাতে তখন কয়েকটি খেজুর ছিল এবং তিনি সেগুলো খাচ্ছিলেন। রাসূল (ﷺ) এর এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে সোজা যুদ্ধের ময়দানে চলে যান এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন।

[সহীহ বুখারী]

এদিকে কুরাইশের হতভাগারা রাসূল (ﷺ) এর ওপর নির্দয়ভাবে তির নিক্ষেপ করছিল; কিন্তু রাসূল (ﷺ) এর পবিত্র জবানে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল,
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون
হে আল্লাহ, তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও। তারা তো জানে না।

রাসূল (ﷺ) এর চেহারা মুবারক থেকে তখনো রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল; আর রহমতের রাসূল (ﷺ) তাঁর চেহারা থেকে সেই রক্ত মুছে নিচ্ছিলেন। রাসূল (ﷺ) বলেন, 'যদি এই রক্তের একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়ত, তাহলে সবার ওপর আল্লাহর আজাব নেমে আসত। '

[ফাতহুল বারি]

এদিকে রাসূল (ﷺ) এর দৃঢ় অবস্থানের কারণে কাফিররা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে যায় এবং ঘোষণা দেয়, আগামী বছর বদরে আবার মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে।

এ যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে ৭০ জন শহিদ হন; আর কাফিরদের পক্ষে মাত্র ২২ বা ২৩ জন নিহত হয়।

কুরাইশ ও ই*য়াহুদিদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র

রাসূল (ﷺ) যখন মদিনায় আসেন, তখন এখানকার ই*য়াহুদিদের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি করেন। তিনি সর্বদা এই চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; কিন্তু ই*য়াহুদিদের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। রাসূল (ﷺ) এর আগমনের পর ইসলামের ক্রমাগত উন্নতি ও শক্তি দেখে তাদের মনে হিংসা, ক্ষোভ আর ক্রোধ সৃষ্টি হয়। এ জন্য তারা সবসময় রাসূল (ﷺ) সহ সকল মুসলিমের বিরোধিতায় নিয়োজিত থাকে।

বদর যু/দ্ধে মুসলিমদের বিস্ময়কর বিজয় ই*য়াহুদিদের ক্ষোভ ও হিংসা আরও বাড়িয়ে দেয়। সুপ্ত এই বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে চলে আসে। এবার তারা খোলাখুলি চুক্তি লঙ্ঘনের ধৃষ্টতা দেখাতে শুরু করে। দ্বিতীয় হিজরিতে তাদের একটি গোত্র বনু কায়নুকা যু/দ্ধ ঘোষণা করে বসে, বনু নাজির রাসূল (ﷺ) কে হ/ত্যার পাঁয়তারা এবং মদিনায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেওয়ার দুঃসাহস দেখায়। অবস্থা দৃষ্টে রাসূল (ﷺ) তাদের বিরুদ্ধে যু/দ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। তাদের মোকাবিলা করা হলে সকল ই*য়াহুদি দুর্গে আত্মগোপন করে। ফলে এভাবেই তারা দুর্গে

কিছুদিন আত্মগোপনে থাকে। পরে রাসূল (ﷺ) মদিনা থেকে বনু কায়নুকা ও বনু নাজিরকে তাড়িয়ে দেন। এদিকে মক্কার কুরাইশরা তো প্রথম থেকেই মদিনার ই*য়াহুদি ও মু*নাফিকদের সঙ্গে পত্র মারফত মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছিল। এমনকি এই হুমকিও দিচ্ছিল যে, যদি মুহাম্মাদকে তোমরা সেখান থেকে বের করে না দাও, তাহলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধেই যু/দ্ধ করব।

[সুনানু আবি দাউদ]

এ সময় ইসলামের বিরোধিতায় তাদের পারস্পরিক কুটিলতা তাদের মধ্যে ঐক্য ও সেতু-বন্ধনের কাজ করে। ফলে এ পর্যায়ে মক্কার কুরাইশ, মদিনার ই*য়াহুদি ও মু*নাফিকদের সম্মিলিত শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত সব গোত্রের মধ্যে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে। এই ঐক্যের ধারাবাহিক পরিণতি হিসেবেই পঞ্চম হিজরির ১০ মুহাররাম জাতুর রিকার যু/দ্ধ সংঘটিত হয়।
এ বছরের রবিউল আউয়ালে দাওমাতুল জানদাল নামে যে যুদ্ধটি হয়, এটিও এই ষড়যন্ত্রের ফল। এরপর ২ শাবান সংঘটিত হয় বনু মুস্তালিক যু/দ্ধ। এগুলো ছিল মূলত চরম একটি আঘাতের পূর্বাভাস। গাজওয়ায়ে আহজাবের তোড়জোড় ও রণপ্রস্তুতি এই পূর্বাভাসেরই ফল।

গাজওয়ায়ে আহজাব বা খন্দকযু/দ্ধ

মক্কা থেকে মদিনা সবাই ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার দুরভিসন্ধিতে একজোট হয়। পঞ্চম হিজরির জিলকদে সম্মিলিত বাহিনী তাদের সব শক্তি একত্র করে একযোগে মদিনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। ১০ হাজার লোকের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল সশস্ত্র বাহিনী পৃথিবীর বুক থেকে মুসলিমদের চিরতরে উচ্ছেদের লক্ষ্যে মদিনার দিকে এগোয়।

রাসূল (ﷺ) যখন তাদের এগিয়ে আসার সংবাদ অবগত হন, তখন সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শসভা ডাকেন। সব শুনে সালমান ফারসি রা. তখন খোলা ময়দানে বেরিয়ে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না বলে মত প্রকাশ করেন; বরং যেদিক থেকে শত্রুদের মদিনায় প্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে, সেদিকে পরিখা খননের পরামর্শ দেন। তাঁর এই পরামর্শ গৃহীত হয়। পরামর্শ অনুযায়ী রাসূল (ﷺ) ৩ হাজার সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে পরিখা খননে লেগে যান। মাত্র ছয় দিনে পাঁচ গজ গভীর পরিখার কাজ সমাপ্ত হয়। খননকাজে খোদ রাসূল (ﷺ) ও অংশ নেন।

[সিরাতে মুগলতাই]

পরিখা খননের সময় একবার বিশাল আকৃতির একটি পাথরখণ্ড বের হয়। এটি সরাতে সবাই ব্যর্থ হলে রাসূল (ﷺ) তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে পাথরটিতে এমন এক আঘাত করেন যে, সেটি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। এভাবেই পরিখা খনন করা হয়।

এদিকে কা*ফিরদের সম্মিলিত বাহিনী এসে মদিনা অবরোধ করে ফেলে। ফলে মুসলমানরা প্রায় ১৫ দিন অবরুদ্ধ থাকেন। এ সময় ই*য়াহুদিদের শেষ গোত্র বনু কুরায়জাও চুক্তি ভঙ্গ করে কা*ফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।

সম্মিলিত বাহিনীর অবরোধ আর ভেতরে বনু কুরায়জার বিদ্রোহ চরম অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করে। রসদ স্বল্পতার কারণে মুসলমানরা তিন দিন অনাহারে কাটান। সাহাবিরা এ সময় ক্ষুধায় অস্থির হয়ে রাসূল (ﷺ) কে নিজেদের পেট উন্মুক্ত করে দেখান যে, সবাই পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। তিনি তখন তাঁর পবিত্র উদর খুলে দেখান যে, তাতে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে। অবরোধকারীরা পরিখা পেরোতে না পেরে মুসলিমদের ওপর তীর ও পাথর বর্ষণ শুরু করে। উভয় পক্ষেই তখন অনবরত তীর-বর্ষণ চলতে থাকে। অবস্থা এমন সংকটাপন্ন ও শ্বাসরুদ্ধকর ছিল যে, রাসূল (ﷺ) এর চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যায়।

কা*ফিরদের ওপর ঝড়ো হাওয়া ও আল্লাহর সাহায্য

অবশেষে সাজ-সরঞ্জামহীন মুসলিম বাহিনীর তরে মহান আল্লাহর সাহায্য আসে। কা*ফিরদের ওপর এমন ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায় যে, তাদের তাঁবুর খুঁটি পর্যন্ত উড়ে যায় এবং চুলায় থাকা ডেগ-ডেকচি উলটে পড়ে। এই ঝড়ো হাওয়া কা*ফিরদের হতবুদ্ধি করে দেয়। অন্যদিকে তাদের রসদও ফুরিয়ে এসেছিল। এ সময় নুআইম ইবনু মাসউদ রা. এমন এক কৌশল অবলম্বন করেন, এতে করে কা*ফিরদের মধ্যে বিভেদ ও ভাঙন সৃষ্টি হয়। পালানো ছাড়া তখন তাদের আর উপায় থাকেনি। ফলে অল্পসময়ে নিদারুণ পরাজয়ের দাগ নিয়ে যু*দ্ধের ময়দান খালি করে তারা ফিরে যায়।

এ বছরের বিভিন্ন ঘটনা

- এ বছর হজ ফরজ হয়। অবশ্য হজ ফরজ হওয়ার তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

জামাদিউল উলায় রাসূল (ﷺ) এর নাতি আবদুল্লাহ ইবনু উসমান অর্থাৎ, নবিকন্যা রুকাইয়ার ছেলে আবদুল্লাহ ই/ন্তে*কাল করেন।

এ বছর শাওয়ালের শেষ দিকে আয়েশা রা.-এর মায়ের ই/ন্তে*কাল হয়।

এ বছরের জিলকদে জায়নাব বিনতু জাহাশ রা. রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এ বছরই মদিনায় ভূমিকম্প ও চন্দ্রগ্রহণ হয়।[সিরাতে মুগলতাই]

হুদায়বিয়ার সন্ধি

ষষ্ঠ হিজরির জিলকদে রাসূল (ﷺ) উমরা করার নিয়তে ইহরাম বাঁধেন। তাঁর সঙ্গে ১৪ বা ১৫ শত সাহাবির বিরাট জামাআত মক্কা অভিমুখে রওনা হয়। হুদায়বিয়া মক্কা থেকে ১৬ মাইল বা ২৫.৭৬ কিলোমিটার দূরে একটি কূপের নাম; এর নামানুসারেই এলাকার নামও হুদায়বিয়া। রাসূল (ﷺ) এখানে যাত্রাবিরতি করেন।

রাসূল (ﷺ) এর মুজিজা

সেখানে একটি কূপ একেবারে শুকনো ছিল। রাসূল (ﷺ) এর মুজিজায় সেটি পানিতে ভরে ওঠে। হুদায়বিয়ায় পৌঁছার পর তিনি উসমান রা.-কে কুরাইশদের এ মর্মে অবহিত করতে মক্কায় পাঠান যে, তিনি এবার শুধু বায়তুল্লাহ জিয়ারত ও উমরা পালনের জন্যই তাশরিফ এনেছেন, এ ছাড়া অন্য কোনো (রাজনৈতিক) উদ্দেশ্য তাঁর নেই।

উসমান রা. মক্কা পৌঁছতেই কুরাইশ কা/ফিররা তাঁকে আটক করে ফেলে। এদিকে মুসলিমদের মধ্যে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কাফিররা তাঁকে হত্যা করেছে। রাসূল (ﷺ) এর কাছে যখন এ সংবাদ আসে, তখন তিনি একটি বাবলা গাছের নিচে বসে সাহাবিদের কাছ থেকে জি/হা*দের বায়আত নেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এবং এটিকে বায়আতে রিজওয়ান বলা হয়।

পরে জানা যায়, উসমান-হত্যার খবরটি ছিল মিথ্যা; বরং কুরাইশরা মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সন্ধির শর্তসমূহ চূড়ান্ত করতে সুহায়েল ইবনু আমরকে পাঠায়। পরে নিম্নোক্ত শর্তগুলো চূড়ান্ত করে অঙ্গীকারপত্র লেখা হয় এবং ১০ বছরের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি চুক্তি হয় :

১. মুসলিমরা এবার উমরা না করেই ফিরে যাবেন।

২. আগামী বছর হজ করতে এসে মাত্র তিন দিন থেকে ফিরে যাবেন।

৩. অ*স্ত্র সজ্জিত হয়ে আসতে পারবেন না। তরবারি সঙ্গে রাখা যাবে, তবে তা কোষবদ্ধ থাকবে।

৪. মক্কা থেকে কোনো মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না।

৫. কোনো মুসলমান যদি মক্কায় চলে আসতে চায়, তাকে বাধা দেওয়া যাবে না।

৬. যদি কেউ মদিনা চলে যায়, তাহলে রাসূল (ﷺ) তাকে ফেরত পাঠাবেন।

৭. মদিনা থেকে কেউ মক্কায় চলে এলে কা/ফিররা তাকে ফেরত পাঠাবে না।

এসব শর্ত যদিও বাহ্যত মুসলিমদের বিরুদ্ধে এবং প্রকাশ্যভাবে পরাজয় ও বৈষম্যমূলক ছিল; কিন্তু মহান আল্লাহ কুরআনে একে 'মহা বিজয়' বলে অভিহিত করেন। সাহাবিগণ এভাবে নতজানু হয়ে সন্ধি করাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। রাসূল (ﷺ) তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে বলেন, 'আমার প্রতি এটাই মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং এতেই আমাদের ভবিষ্যৎ-কল্যাণ নিহিত।'

পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহ এ রহস্যের সমাধান করে দেয়- যেমন : সন্ধির কল্যাণে শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে মক্কা-মদিনার মধ্যে যাতায়াত শুরু হয়। কা/ফিররা রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে এবং মুসলিমদের কাছে বিনা বাধায় আসা-যাওয়া করতে থাকে। এদিকে ইসলামি চরিত্রের চুম্বক শক্তি কা/ফিরদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করতে শুরু করে।

ইতিহাসবিদরা বলেন, এ সময় এত অধিক পরিমাণ লোক ইসলাম গ্রহণ করে, ইতিপূর্বে কখনো এমন হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এ সন্ধি ছিল মক্কা-বিজয়েরই ভূমিকা।

বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে চিঠি

হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে দাওয়াতের পথ মসৃণ হয়। তখন রাসূল (ﷺ) সত্যের এই আহ্বান গোটা দুনিয়ার শাসকদের কাছে পৌঁছে দিতে মনস্থ করেন। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে আমর ইবনু উমাইয়া রা. কে হাবশার বাদশাহ আসহামা নাজাশির কাছে পাঠান। আসহামা রাসূল (ﷺ) এর চিঠিটি তাঁর উভয় চোখে রেখে সিংহাসন থেকে নিচে নেমে মাটিতে বসে পড়েন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (ﷺ) -এর যুগেই তিনি ই*ন্তেকাল করেন।

দাহইয়া কালবি রা.-কে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠান। রাসূল (ﷺ) যে সত্য নবি, তা তিনি অকাট্য প্রমাণাদি ও অতীতের আসমানি গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে স্পষ্ট জানতে পেরেছিলেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেন; কিন্তু এতে তার সকল প্রজা খেপে যায়। তাই তিনি এই চিন্তায় ভীষণ ভয় পেয়ে যান যে, আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি, এরা আমাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। এ জন্য তিনি ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

আবদুল্লাহ ইবনু হুজায়ফা রা.-কে পারস্যের সম্রাট খসরু পারভেজের কাছে পাঠান। এই হতভাগা রাসূল (ﷺ) এর চিঠির সঙ্গে অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে এবং চিঠিটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। রাসূল (ﷺ) এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তার জন্য বদদুআ করেন-'আল্লাহ তার সাম্রাজ্যকে এমন ভাবে টুকরো টুকরো করে দিন, যেভাবে সে আমার চিঠিটি টুকরো টুকরো করেছে।' রাসূল (ﷺ) এর দুআ বিফলে যায়নি। কিছুদিন পরই খসরু পারভেজ তার পুত্র শিরওয়াহর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।

এ ছাড়া হাতিব ইবনু আবি বালতাআ রা.-কে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকিসের কাছে পাঠান। আল্লাহ তাঁর অন্তরে ইসলামের সত্যতা ও রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে বিশ্বাস ঢেলে

দিয়েছিলেন। ফলে বাদশাহ মুকাওকিস হাতিব ইবনু আবি বালতাআর রা. সঙ্গে অত্যন্ত উত্তম আচরণ করেন এবং রাসূল (ﷺ) এর জন্য কিছু উপহারও পাঠান। এর মধ্যে মারিয়া কিবতিয়া নামের একজন দাসী এবং দুলদুল নামে সাদা রঙের একটি খচ্চরও ছিল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ১ হাজার স্বর্ণমুদ্রা আর একজোড়া কাপড়ও ছিল।
আমর ইবনুল আস রা.-কে চিঠিসহ আম্মানের বাদশাহ জাইফার ও আবদুল্লাহর কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পাঠান। তাঁদের উভয়ের অন্তরেও ব্যক্তিগত অনুসন্ধান আর আসমানি কিতাবাদির মাধ্যমে রাসূল (ﷺ) এর সত্য নবি হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে। পরে তাঁরা উভয়ে মুসলমান হন। তখন থেকেই তাঁরা তাঁদের প্রজাদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করতে থাকেন এবং আমর ইবনুল আসের হাতে যাকাতের সেসব সম্পদ অর্পণ করেন।

গাজওয়ায়ে খায়বার বা খায়বার যুদ্ধ

মদিনার ই*য়াহুদিদের মধ্যে বনু নাজির সম্প্রদায় যখন খায়বারে(১৬১) গিয়ে বসতি স্থাপন করে, তখন খায়বার ই*য়াহুদিদের কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত হয়। সেখান থেকেই তারা পুরো আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত।

তাদের শায়েস্তা করতে সপ্তম হিজরির মুহাররাম বা জামাদিউল উলায় রাসূল (ﷺ) ৪০০ পদাতিক এবং ২০০ অশ্বারোহী সেনার বাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবিলার জন্য খায়বারে উপস্থিত হন। উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই এবং ব্যাপক হতাহত হয়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয় দান করেন এবং ই*য়াহুদিদের সব দুর্গ তখন মুসলিমদের হাতে চলে আসে।

খায়বারের এই যুদ্ধে আলি রা. বিশেষ রণনৈপুণ্য দেখান। তিনি একাই হাত দিয়ে খায়বারের দুর্গফটক উপড়ে ফেলে দেন; অথচ ফটকটি একসঙ্গে ৭০ জন লোকও নাড়াতে পারত না। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, আলি রা. যুদ্ধে এই ফটকটি হাতের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

কাজা উমরা আদায়

গত বছর (ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে উমরা আদায় করা সম্ভব হয়নি এবং কুরাইশ কা/ফিরদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে, 'মুসলিমরা আগামী বছর উমরা

আদায় করবে এবং তিন দিনের বেশি সময় মক্কায় থাকবেন না।' এ বছর সেই প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি অনুযায়ী রাসূল (ﷺ) তাঁর সাহাবিদের নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হন এবং চুক্তির সব শর্ত মেনে উমরা পালন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মক্কা বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে যেসব শর্ত লেখা ছিল, মুসলিমরা তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেগুলো পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করছিলেন। কিন্তু অষ্টম হিজরিতে কুরাইশরা সেই সন্ধি ভঙ্গ করে বসে। রাসূল (ﷺ) একজন দূত পাঠিয়ে চুক্তিনামা নবায়নের জন্য কুরাইশদের সামনে তখন কয়েকটি শর্ত দেন এবং শেষের দিকে লিখে দেন যে, এ শর্তগুলো তাদের মনঃপুত না হলে হুদাবিয়ার সন্ধি ভেঙে গেছে বলে মনে করতে হবে। ফলে কুরাইশরা সন্ধি ভঙ্গের প্রস্তাবই গ্রহণ করে।

এরপর রাসূল (ﷺ) যু*দ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং অষ্টম হিজরির ১০ রমজান মঙ্গলবার আসরের নামাজের পর ১০ হাজার সাহাবির বিশাল এক বাহিনী সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন। তারপর 'কুদায়বিয়া' নামক স্থানে মাগরিবের সময় হলে সবাই সেখানে ইফতার করেন। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছার পর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. কে মুসলিম বাহিনীর একটি অংশসহ উপর দিকের রাস্তা দিয়ে মক্কায় প্রবেশের জন্য পাঠান। তাঁদের এটাও বলে দেন যে, 'কেউ তোমাদের সঙ্গে সংঘর্ষে না জড়ালে তোমরাও তরবারি উন্মুক্ত করবে না।'

এদিকে রাসূল (ﷺ) নিজে অপর প্রান্ত দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং সাধারণ ঘোষণা দেন- 'যে মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে-ও নিরাপদ। যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে-ও নিরাপদ।' অবশ্য তিনি ১১ জন পুরুষ আর চারজন মহিলার রক্ত ক্ষমা করেননি। কারণ, তাদের অস্তিত্বই ছিল যাবতীয় বিশৃঙ্খলার মূল। কিন্তু তারা সবাই এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। পরে তাদের অধিকাংশই মক্কা বিজয়ের পর মদিনায় পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করে।

২০ রমজান শুক্রবার রাসূল (ﷺ) তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। তখন পর্যন্ত কাবার আশপাশে ৩৬০টি মূর্তি যথারীতি বিদ্যমান ছিল। এ সময় রাসূল (ﷺ) এর হাতে একটি কাঠের টুকরো ছিল। তিনি যখন একটি মূর্তির পাশ দিয়ে যেতেন, তখনই কাঠ দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করতেন আর মূর্তিটি মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। তখন তাঁর পবিত্র মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল :

وَ قُلۡ جَآءَ الۡحَقُّ وَ زَهَقَ الۡبَاطِلُ ؕ اِنَّ الۡبَاطِلَ کَانَ زَهُوۡقًا﴿۸۱﴾

অনুবাদ : সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।

[সুরা বনি ইসরাইল : ৮১]

মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ

তাওয়াফ সমাপ্ত করে রাসূল (ﷺ)। কাবা শরিফের চাবি রক্ষক উসমান ইবনু তালহা শাইবির কাছ থেকে কাবার চাবি নিয়ে কাবার ভেতরে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে মাকামে ইবরাহিমে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে তিনি মসজিদে তাশরিফ নেন। এদিকে লোকজন গভীর উৎকণ্ঠায় এ অপেক্ষা করছিল যে, রাসূল (ﷺ) কুরাইশদের ব্যাপারে আজ কী নির্দেশ জারি করেন। কিন্তু সব দ্বিধা, সংশয় আর উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে রাসূল (ﷺ) কুরাইশদের সম্বোধন করে বলেন, 'তোমারা সব দিক থেকে স্বাধীন ও নিরাপদ!' তারপর তিনি কাবা ঘরের চাবিও তাদের হাতে ফেরত দিয়ে দেন।

রাসূল (ﷺ) চরিত্র মাহাত্ম্য ও আবু সুফিয়ান (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ

আবু সুফিয়ান (রা.)- যিনি রাসূল (ﷺ) এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের সর্বাপেক্ষা বড় নেতা ছিলেন এবং তাদের পরিচালিত প্রায় সব যু*দ্ধে তিনি প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করে আসছিলেন- মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে গোপনে মুসলিম বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহ করতে তিনি মক্কা থেকে বেরোলে সাহাবিরা তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। বন্দি অবস্থায় তাঁকে রহমতে আলম রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে আনা হলে তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দেন। রাসূল (ﷺ) এর মহত্ত্ব ও উদারতার ফলে আবু সুফিয়ান রা. তখনই কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। ফলে আজ তাঁর নামের সঙ্গে 'রাজিআল্লাহু আনহু' উচ্চারণ করা হয়।

মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি ভীত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রাসূল (ﷺ) এর দরবারে উপস্থিত হয়। করুণার নবি (ﷺ) তাকে বলেন, 'শান্ত হও, আমি কোনো রাজা-বাদশাহ নই, আমি তো একজন সাধারণ মায়ের সন্তান।'

মক্কা বিজয়ের পর ১৫ দিন(১৬৫) রাসূল (ﷺ) সেখানে অবস্থান করেন।

এ সময় মদিনার আনসাররা এ কথা ভেবে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন যে, এখন হয়তো রাসূল (ﷺ) মক্কায় থেকে যাবেন; আর আমরা তাঁর থেকে দূরে থেকে যাব। কিন্তু রাসূল (ﷺ) যখন তাঁদের এই সংশয় আঁচ করতে পারেন, তখন বলেন, 'এখন তো আমার জীবন-মরণ তোমাদেরই সঙ্গে জড়িত।'

এরপর রাসূল (ﷺ) আত্তাব ইবনু উসায়েদ রা. কে মক্কার গভর্নর মনোনীত করে মদিনার উদ্দেশে রওনা হন।

হুনাইন যু*দ্ধ

মক্কা বিজয়ের পর সাধারণভাবে আরবের লোকেরা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। কেননা, তাঁদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিলেন, যাঁরা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিঃশ্চিন্ত হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের ভয়ে ইসলাম গ্রহণে দেরি করছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিলেন। এখন তাঁদের সবাই দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেন। বাকি আরবদের তখন এমন শক্তি বা সাহস ছিল না যে, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্র দুটি নিজেদের আত্মসম্মানবোধ থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যু*দ্ধের জন্য মক্কার দিকে এগোয়।

রাসূল (ﷺ) এ ব্যাপারে অবগত হয়ে ১২ হাজার সেনার এক বিশাল বাহিনী তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করেন। এঁদের মধ্যে ১০ হাজার ছিলেন আনসার ও মুহাজির, যাঁরা মক্কা বিজয়ের সময় মদিনা থেকে রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে ছিলেন, আর ২ হাজার ছিলেন নওমুসলিম, যাঁরা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ সংখ্যাটি তখন পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীর সবচেয়ে বড় সংখ্যা ছিল।

অষ্টম হিজরির ৬ শাওয়াল আল্লাহর এ বাহিনী রওনা হয়। তাঁরা যখন হুনাইন প্রান্তরে পৌঁছান, তখন পাহাড়ের ঘাঁটিতে আত্মগোপনকারী শত্রুরা অতর্কিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালিয়ে বসে। যেহেতু তখনো সেনাদের সারি-বিন্যাসই সম্পন্ন হয়নি, তাই মুসলিম বাহিনীর সম্মুখভাগ পিছু হটা শুরু করে।

এই পিছু হটার বাহ্যিক কারণ সারি-বিন্যাসের অপূর্ণতা আর মক্কার নওমুসলিমদের ভয় বলা হলেও প্রকৃত কারণের ইঙ্গিত পবিত্র কুরআনে এভাবে রয়েছে যে- অর্থাৎ, মুসলিমরা তখন

নিজেদের চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীতে নিজেদের সংখ্যাধিক্য এবং সাজ-সরঞ্জাম দেখে গর্ববোধ করছিলেন। কোনো কোনো সাহাবি, এমনকি আবু বকর রা.- এর মতো ব্যক্তির মুখ থেকে এ ধরনের কথা উচ্চারিত হয়েছিল যে, 'আজ আমরা পরাজিত হতে পারি না।' এ জন্য আল্লাহ তাঁদের সতর্ক করতে এ ব্যবস্থা নেন, যেন মুসলিমরা বুঝতে পারেন, জয়-পরাজয় আমাদের হাতে নয় এবং এটা তীর- তরবারির ওপরও নির্ভরশীল নয়। বদর যু*দ্ধে নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এত বড় বিজয়; আর হুনাইন যু*দ্ধে এত বিপুল সাজসরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক পরাজয়ের এটাই সেই নিগূঢ় রহস্য।

রাসূল (ﷺ) তখন দুটি বর্ম পরে দুলদুলে বসা ছিলেন। নিজের বাহিনীকে পিছু হটতে দেখে তাঁর নির্দেশে আব্বাস রা. মুসলিমদের এক বীরত্বপূর্ণ আওয়াজ দ্বারা দৃঢ় থাকার আহ্বান জানান। এতে নড়বড়ে ও টালমাটাল বাহিনী পুনরায় সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যু*দ্ধ শুরু হয়।

একমুঠো মাটি দ্বারা শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করা

এদিকে রাসূল (ﷺ) একমুঠো মাটি নিয়ে শত্রু বাহিনীর ওপর নিক্ষেপ করেন। আল্লাহর কুদরতে এই একমুঠো মাটি শত্রু বাহিনীর প্রত্যেক সেনার চোখে গিয়ে পড়ে। এমনকি একটি সেনাও তা থেকে রক্ষা পায়নি।শেষ পর্যন্ত শত্রুবাহিনী ভীত হয়ে পালায় এবং পরাজিত হয়।

এই যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে মাত্র চারজন এবং ৭০ জনের চেয়ে বেশি শত্রুসেনা নিহত হয়। মুসলমানরা তখন প্রতিশোধ স্পৃহায় শিশু ও মহিলাদের প্রতি আক্রমণে উদ্যত হলে রাসূল (ﷺ) তাঁদের এ কাজ থেকে বিরত রাখেন।

তায়েফ যু*দ্ধ

এরপর রাসূল (ﷺ) তায়েফের দিকে দৃষ্টি দেন। তায়েফ ছিল বনু সাকিফ ও বনু হাওয়াজিনের কেন্দ্র। প্রায় ১৮ দিন তাদের অবরুদ্ধ রাখার পরও বিজয় অর্জিত হয়নি। ফলে অবরোধ তুলে ফেরার সময় জিইররানা নামক স্থানে যখন পৌঁছান, তখন তায়েফের হাওয়াজিনের একটি প্রতিনিধিদল রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে এসে আবেদন করে, হুনাইন যু*দ্ধে মুসলিমদের হাতে তাদের যে সকল লোক বন্দি রয়েছে, তাদের যেন মুক্তি দেওয়া হয়। রাসূল (ﷺ) তাদের

আবেদনে সাড়া দিয়ে বন্দিদের মুক্ত করেন। এরপর তিঁনি (ﷺ) যখন তায়েফ থেকে মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তায়েফের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর খিদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করে।

গাজওয়ায়ে তাবুক বা তাবুক যু/দ্ধ ও ইসলামে চাঁদার প্রচলন

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরির মাঝামাঝি পর্যন্ত রাসূল (ﷺ) মদিনায় অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে, মুতার যু*দ্ধে পরাজিত রোমানরা পুনরায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যু*দ্ধের জন্য তাবুকে সেনা সমাবেশ করে যু*দ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেছে। রোমানদের রণ প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে রাসূল (ﷺ)-ও যু*দ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু সময়টা ছিল বেশ কঠিন। দুর্ভিক্ষের কারণে মুসলিমরা অভাব-অনটনে দিয়ে দিন পার করছিলেন। এ ছাড়া তখন প্রচণ্ড গরম ছিল। কিন্তু সাহাবিরা তো ছিলেন দীনের প্রতি আত্মোৎসর্গকারী মহান কাফেলা। তাঁরা এতসব বিপদের পরও দীনের সাহায্যে যু*দ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

এবারই প্রথম যুদ্ধের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। রাসূল (ﷺ) এর আবেদনে সাহাবিরা প্রাণ উজাড় করে অর্থ সম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করেন। আবু বকর রা. ঘরের সব জিনিসপত্র রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে পেশ করেন। উসমান রা. যুদ্ধ-তহবিলে বড় ধরনের সাহায্য করেন। তাতে ৯০০ উট এবং ১০০ ঘোড়া ছিল।

এরপর রজবের বৃহস্পতিবার ৩০ হাজার সাহাবির এক বিশাল কাফেলা নিয়ে রাসূল (ﷺ) তাবুকের দিকে রওনা দেন।

কয়েকটি মুজিজা

ক. তাবুক যাওয়ার পথে রাসূল (ﷺ) আবু জার গিফারি রা. কে দেখতে পান, তিনি একাকী পথ চলছেন। এটা দেখে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'সে দুনিয়ায় একাকী চলবে, একাকী জীবন কাটাবে এবং একাকী মৃ*ত্যুবরণ করবে।' বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল।

খ. এ যু*দ্ধ সফরেই রাসূল (ﷺ) এর উটনী হারিয়ে যায়। তখন আল্লাহ তাআলা জিবরিল আ. এর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেন যে, উটনীর লাগাম অমুক জায়গায় একটি গাছের সঙ্গে আটকে আছে। পরে সেখানে গিয়ে উটনীকে এ অবস্থায়ই পাওয়া যায়।

গ. মুসলমানগণ যখন তাবুকে পৌঁছান, তখন সেখানে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার বাহিনী নিয়ে হিমসে চলে যায়। রাসূল (ﷺ) তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-কে উকাইদির নামের খ্রি*ষ্টান পাদরির কাছে পাঠান এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'তোমরা রাতে তার সঙ্গে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে তখন শিকারে ব্যস্ত থাকবে।' খালিদ রা. সেখানে পৌঁছে তাকে এ অবস্থায়ই দেখতে পান এবং তাকে বন্দি করে নিয়ে আসেন।

রাসূল (ﷺ) তাবুকে প্রায় ১৫-২০ দিন অবস্থান করেন; কিন্তু কেউ তাঁর মোকাবিলা করতে আসেনি। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে তিনি তাবুক থেকে ফিরে আসেন। এটাই ছিল রাসূল (ﷺ) এর শেষ গাজওয়া বা যুদ্ধাভিযান। নবম হিজরির রমজানে তিনি বাহিনী নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রতিনিধি দলের আগমন এবং দলে দলে লোকজনের ইসলামে প্রবেশ

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সর্বত্র যখন শান্তি ও নিরাপত্তা-পরিস্থিতি বিরাজ করে, সার্বিক পরিস্থিতি যখন অনুকূলে চলে আসে, তখন ইসলামের প্রচার-প্রসার আরও বিস্তৃত আঙ্গিকে শুরু হয়। এ জন্য হুদায়বিয়ার সন্ধিকে আসমানি দপ্তরে (আল্লাহর কাছে) বিজয় গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু এরপরও কিছু মানুষ কা/ফির কুরাইশদের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারছিলেন না। তাঁদের জন্য মক্কা বিজয় সেই বাধাও দূর করে দেয়। ফলে তখন থেকেই সমগ্র আরবে পবিত্র কুরআন তার নিজের অলৌকিক ক্ষমতাবলে মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। এর অনিবার্য ফল দাঁড়ায়-একসময় যাঁরা ইসলাম ও মুসলিমদের চেহারাও দেখতে চাইতেন না, আজ তাঁরাই দলে দলে রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে আসতে থাকে এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের জানমাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। এসব প্রতিনিধিদলের অধিকাংশই নবম হিজরিতে রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে উপস্থিত হয়।

১. বনু সাকিফের প্রতিনিধি দল

তাবুক যু*দ্ধের পর বনু সাকিফের প্রতিনিধি দল মদিনায় রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করে।

এরপর ধারাবহিকভাবে প্রতিনিধি দলের আগমন শুরু হয়। এসব প্রতিনিধি দলের সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়।(১৭১)

২. বনু ফাজারার প্রতিনিধি দল

এই গোত্রের লোকেরা মদিনায় আসার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তাঁরা প্রতিনিধি দল হিসেবে মদিনায় রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে উপস্থিত হন।

৩. বনু তামিমের প্রতিনিধি দল

বনু তামিমের প্রতিনিধি দল রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে এসে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তাঁরা সবাই মুসলমান হয়ে যান।

৪. বনু সাআদ ইবনু বকরের প্রতিনিধি দল

এই প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন জিমাম ইবনু সালাবা। তিনি রাসূল (ﷺ) কে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। রাসূল (ﷺ) তাঁর সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেন। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর অন্তর থেকে যখন সব দ্বিধা-সন্দেহ দূর হয়ে যায়, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর আপন গোত্রে ফিরে গিয়ে ইসলামের প্রচার করতে থাকেন। ফলে এক পর্যায়ে তাঁর গোত্রের সবাই মুসলমান হয়ে যান।

৫. কিন্দার প্রতিনিধি দল

পবিত্র কুরআনের সুরা সাফফাতের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত শুনেই এই প্রতিনিধিদলের অন্তরে ইসলাম ঠাঁই করে নেয়। তাঁরা সবাই মুসলমান হয়ে যান।

৬. বনু আবদে কায়েসের প্রতিনিধি দল

এই গোত্রের সবাই খ্রি*ষ্টধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। এরপর তাঁরা রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে এসে মুসলমান হন। তিনি এ সময় ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি তাঁদের শিক্ষা দেন।।

৭. বনু হানিফের প্রতিনিধি দল

এই গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে এসে মুসলমান হয়। তাদের মধ্যে মুসায়লিমাও ছিল। সে পরবর্তী সময়ে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবির কারণে 'মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব' নামে কুখ্যাতি লাভ করে। আবু বকর রা.-এর খিলাফতকালে তার সকল অনুসারীসহ সাহাবিদের হাতে নিহত হয়।

শিক্ষণীয়, মুসায়লিমা যখন নবুওয়াতের দাবি করে, তখন সে রাসূল (ﷺ), কুরআন ও ইসলামকে অস্বীকার করেনি। এ প্রসঙ্গে হাদিস ও তাফসির শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম শায়খ আবু জাফর তাবারি রাহ. তাঁর আত-তারিখ গ্রন্থে লেখেন, 'মুসায়লিমা তার মুআজ্জিনকে আজানের মধ্যে সবসময় 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' বলার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু শেষ নবি মুহাম্মাদ (ﷺ)- এর পর যেহেতু কোনো প্রকার নবুওয়াতের দাবি করা অবৈধ; বরং সাধারণভাবে নবুওয়াতের দাবি করা কুরআনের অসংখ্য আয়াত, মুতাওয়াতির হাদিস এবং উম্মাহর ঐকমত্যে খতমে নবুওয়াতের সর্বসম্মত আকিদাকে অস্বীকার করা হয়, এ জন্য সাহাবিরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মুসায়লিমা যে শরিয়তহীন নবুওয়াতের দাবি করছে, তা কু*ফরি এবং দীন ছেড়ে মুরতাদ হওয়ার নামান্তর। ফলে তাঁরা সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে যু*দ্ধ ঘোষণা করেন। আজান, নামাজ, তিলাওয়াত এসব কাজ বহাল রাখলেও তাকে কা*ফির-মুরতাদ বলা থেকে তাঁদের বাধা দিয়ে রাখতে পারেনি।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির দাবি মুসায়লিমাতুল কাজ্জাবের চেয়েও মারাত্মক। সে নিজেকে সকল নবি থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে মনে করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং অনেক নবি সম্পর্কে এমন পীড়াদায়ক ও অপমানজনক মন্তব্য করেছে, যা কোনো সভ্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে সে ইসা আ. সম্পর্কে এমন সব অপবাদ আরোপ করেছে এবং নোংরা ভাষায় গালাগাল করেছে যে, কোনো মুসলমান তা শুনে ধৈর্য ধরে থাকতে পারে না।

৮. বনু কাহতানের প্রতিনিধি দল

এই গোত্রের নেতা ছিলেন জায়েদ আল খায়ল। তাঁরা রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে এসে সবাই মুসলমান হয়ে যান।

৯. বনু হারিসের প্রতিনিধি দল

এই প্রতিনিধি দলে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. ছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গী সাথিদের নিয়ে মুসলমান হয়ে যান।

এভাবে বনু আসআদ, বনু মুহারিব, হামদান, গাসসান ইত্যাদি গোত্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে আসার আগে; আবার কেউ কেউ এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। হিমইয়ারের বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের নিজ নিজ গোত্রের বাদশাহ মনে করা হতো। তাঁদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি এসে রাসূল (ﷺ) কে সংবাদ দেন যে, তাঁরা সবাই স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে গেছেন।

এভাবে পায়ে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে প্রতিনিধি দল রাসূল (ﷺ) এর খিদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। ফলে দশম হিজরির বিদায় হজের সময় ১ লাখের বেশি মুসলমান রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে হজ আদায় করতে যান। এ ছাড়া অনুপস্থিতদের সংখ্যা তখন এরচেয়ে অনেক বেশি ছিল।

বিদায় হজ ও আরাফাতের ঐতিহাসিক ভাষণ

হুজ্জাতুল ইসলাম বা বিদায় হজ

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্পূর্ণ হল এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্বে অস্বীকৃতি এবং রাসূল (ﷺ)-এর পয়গম্বরের ভিত্তির উপর এক নতুন সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হল। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল (ﷺ)-এর নিকট আভাষ দেয়া হচ্ছিল যে, পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানের সময় কাল ফুরিয়ে এসেছে। এ প্রেক্ষিতে রাসূল (ﷺ) মু'আয বিন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন দশম হিজরী সনে। তখন তাঁর বিদায়কালে অন্যান্য উপদেশাবলীর সঙ্গে এ কথাও বললেন,

'হে মু'আয! এ বছরের পর তোমার সঙ্গে আমার হয়ত আর সাক্ষাত নাও হতে পারে, তখন হয়ত বা আমার এ মসজিদ এবং আমার কবরের পাশ দিয়ে তোমরা যাতায়াত করবে।'

রাসূল (ﷺ)-এর মুখ থেকে মু'আয রা. এ কথা শুনে আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এটাই চেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ইসলামী দাওয়াতের কার্যকারিতা এবং সুফল বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিয়ে দেবেন। এ দাওয়াতের কাজেই রাসূল (ﷺ) অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন এবং অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বস্তুত তাঁর এ অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত কর্মকাণ্ডের অন্তিম পর্যায়ে এটাই সুসঙ্গত হবে যে, হজের মৌসুমে যখন মক্কার পার্শ্ববর্তী আরব গোত্রসমূহের সদস্য ও প্রতিনিধিগণ একত্রিত হবেন তখন তাঁরা রাসূল (ﷺ)-এর নিকট থেকে দ্বীনের আহবান এবং শরীয়তের বিধানসমূহ জেনে নেবেন এবং রাসূল (ﷺ) তাঁদের নিকট থেকে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন যে, তিনি তাঁদের নিকট আল্লাহর পবিত্র আমানত যথার্থভাবে পৌছে দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন এবং উম্মতের কল্যাণ কামনার হক আদায় করেছেন।

১০ হিজরির ২৫ জিলকদ সোমবার রাসূল (ﷺ) হজ করতে মক্কার উদ্দেশে রওনা দেন। সাহাবিদের বিশাল জামাআত তাঁর সফরসঙ্গী হন, যাঁদের সংখ্যা ১ লাখের চেয়ে বেশি ছিল। মদিনা থেকে ছয় মাইল দূরে জুলহুলাইফায় তাঁরা হজের জন্য ইহরাম বাঁধেন। এরপর ৪ জিলহজ সোমবার মক্কায় প্রবেশ করে হজের কার্যাবলি সম্পন্ন করেন।

আরাফাতের খুতবা বা বিদায় হজের ভাষণ

৯ জিলহজ রাসূল (ﷺ) আরাফাতের ঐতিহাসিক ময়দানে উপস্থিত হন এবং অত্যন্ত নাতিদীর্ঘ ও সাহিত্যালংকারপূর্ণ এক ভাষণ দেন, যে ভাষণ মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণের নীতিমালা ও উপদেশে ভরপুর ছিল। এটাই ছিল রাসূল (ﷺ) শেষ ভাষণ। ঐতিহাসিক সেই ভাষণের অংশবিশেষ নিচে তুলে ধরা হলো, যেগুলো প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে গেঁথে রাখা জরুরি।

রাসূল (ﷺ) বলেন,

লোকসকল, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, যাতে আমি তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয় বর্ণনা করতে পারি। আমি জানি না। আগামী বছর আমি তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারব কি না।

রাসূল (ﷺ) আরও বলেন,

মুসলিমদের জানমাল, ইজ্জত-সম্মান কিয়ামত পর্যন্ত এমনভাবে পবিত্র ও সম্মানিত, যেভাবে আজকের এ দিন (আরাফাতের দিন), এ মাস (জিলহজ মাস) এবং এ শহর (পবিত্র মক্কা) তোমাদের কাছে পবিত্র- সম্মানিত। এ জন্য কারও কাছে যদি অন্য কারও আমানত থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই সেটা আদায় করতে হবে।

তিঁনি (ﷺ) আরও বলেন,

হে লোকেরা, তোমাদের স্ত্রীদের তোমাদের ওপর কিছু অধিকার রয়েছে, যেভাবে স্ত্রীদের ওপর তোমাদের কিছু আধিকার রয়েছে। সকল মুসলমান একে অপরের ভাই। কারও জন্য তার ভাইয়ের সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া নেওয়া বৈধ নয়।

আমার পরে তোমরা আবারও কা/ফির হয়ে যেয়ো না। একে অপরকে হ/ত্যা করো না। আমার অবর্তমানে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব কুরআন রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি কুরআনের যাবতীয় বিধান শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।

রাসূল (ﷺ) আরও বলেন,

হে লোকসকল, তোমাদের রব একজন, তোমাদের আদি পিতা একজন; তোমরা সবাই আদম আ.-এর সন্তান; আর আদম আ. মাটির সৃষ্টি। তোমাদের সে-ই সবচেয়ে অধিক সম্মানী, যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু। (মনে রেখো,) কোনো আরব খোদাভীতি ছাড়া কোনো অনারবের ওপর শ্রেষ্ঠ হতে পারে না।

স্মরণ রেখো, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর দীন পৌঁছে দিয়েছি।
হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি তাঁদের কাছে আপনার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। তোমরা যাঁরা এখানে উপস্থিত, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে অনুপস্থিতদের মধ্যে এসব কথা পৌঁছে দেওয়া।

হজ শেষে রাসূল (ﷺ) আরও ১০ দিন মক্কায় অবস্থান করেন। এরপর মদিনায় ফিরে আসেন।

রাসূল (ﷺ) এর অসুস্থতা, অন্তিমশয্যা ও ই*ন্তেকাল

১১ হিজরির ২৮ সফর বুধবার রাতে রাসূল (ﷺ) এর 'বাকিয়ে গারকাদ' কবরস্থান জিয়ারতে যান এবং কবরবাসীদের জন্য দুআ করেন। দুআয় তিনি বলেন, 'কবরবাসীরা, তোমাদের বর্তমান অবস্থা এবং কবরের অবস্থান কল্যাণকর হোক। কেননা, পৃথিবী এখন থেকে ফিতনার আঁধারে ছেয়ে যাবে।'

জিয়ারত শেষে ফেরার পর রাসূল (ﷺ) এর মাথাব্যাথা শুরু হয়। এরপর জ্বরও চলে আসে।(১৭৫) বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী এই জ্বর ১৩ দিন স্থায়ী ছিল এবং এ অসুস্থতায় তিনি ই*ন্তেকাল করেন। অসুস্থতার এ সময়ে তিনি প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী স্ত্রীদের ঘরে যাতায়াত করেন।(১৭৬) তবে অসুস্থতা যখন বেড়ে যায়, তখন স্ত্রীদের কাছ থেকে এভাবে অনুমতি নেন যে, অসুস্থতার দিনগুলো তিনি আয়েশা রা.-এর ঘরে থাকতে চান। ফলে সবাই তাঁকে অনুমতি দেন এবং তিনি আয়েশা রা. এর ঘরে অবস্থান করতে থাকেন।

আবু বকর (রা.) এর ইমামতি

রাসূল (ﷺ) এর অসুখ ক্রমেই বাড়ছিল এবং এক পর্যায়ে মসজিদেও যেতে পারছিলেন না। সে সময় তিঁনি আবু বকর সিদ্দিক রা.-কে নামাজের ইমামতি করতে নির্দেশ দেন। আবু বকর রা. রাসূল (ﷺ) এর জীবদ্ধশায় প্রায় ১৭ ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করেন।ঘটনাক্রমে একদিন আবু বকর রা. ও আব্বাস রা. আনসার সাহাবিদের এক বৈঠকের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা দেখতে পান উপস্থিত সবাই কাঁদছেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, 'আমরা রাসূল (ﷺ) এর মজলিসের কথা স্মরণ করে কাঁদছি।' আব্বাস রা. তাঁদের এই অবস্থার কথা রাসূল (ﷺ) কে জানান। তিনি তখন আলি রা. ও ফাজল ইবনু আব্বাস রা.-এর কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে বের হন। আব্বাস রা. তাঁর আগে আগে যাচ্ছিলেন। রাসূল (ﷺ) মিম্বারে উঠতে চাইলেও অসুস্থতার কারণে উঠতে পারেননি; প্রথম সিঁড়িতে বসে পড়েন। এ সময় তিঁনি উপস্থিত সাহাবিদের সামনে অলংকারপূর্ণ এক ভাষণ দেন।

রাসূল (ﷺ) এর শেষ ভাষণ

হে লোকসকল, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা তোমাদের রাসূল (ﷺ) এর মৃ*ত্যুর ব্যাপারে ভয় করছ। তোমাদের জানা থাকা চাই, আমার আগে কোনো নবি কি চিরকাল থেকেছেন যে, আমিও থাকব? হ্যাঁ, আমি আমার মহান রবের সঙ্গে শীঘ্রই মিলতে যাচ্ছি এবং তোমরাও আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তবে তোমাদের সঙ্গে আমার মিলনের স্থান হচ্ছে হাউজে কাউসার। অতএব, যে এটা পছন্দ করে যে, কি*য়ামত দিবসে সে হাউজে কাউসারের পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে, সে যেন আপন হাত ও মুখকে অনর্থক কাজ ও অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত রাখে। আমি তোমাদেরকে তোমাদের মুহাজির ভাইদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং মুহাজিররা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকা ও সদাচরণের অসিয়ত করছি।

রাসূল (ﷺ) আরও বলেন,

মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে, তখন তাদের শাসকরাও তাদের সঙ্গে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করে। আর যখন তাঁর নির্দেশ অমান্য করে, তখন তাদের শাসকরাও তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করে।

সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ এই ভাষণ প্রদানের পর রাসূল (ﷺ) ঘরে ফিরে আসেন। ই*ন্তেকালের পাঁচ অথবা তিন দিন আগে আবারও তিঁনি ঘরের বাইরে বের হন। তখন তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। মসজিদে তখন আবু বকর রা. জোহরের নামাজের ইমামতি করছিলেন। রাসূল (ﷺ) এর আগমন টের পেয়ে আবু বকর রা. পেছনে সরে আসতে থাকলে তিঁনি তাঁকে হাতের ইশারায় নিষেধ করেন এবং নামাজ চালিয়ে যেতে বলেন। এরপর তিনি আবু বকর রা. এর বাম পাশে বসে পড়েন। নামাজ শেষ হলে মুসল্লিদের উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তাতে তিঁনি বলেন,

আমার প্রতি আবু বকরের অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আমার খলিল (বন্ধু) বানাতাম, তাহলে আবু বকরকেই বন্ধু বানাতাম; কিন্তু আল্লাহ ছাড়া যেহেতু আমার কোনো খলিল হতে পারেন না, তাই আবু বকর আমার ভাই ও বন্ধু।

রাসূল (ﷺ) আরও বলেন, 'আবু বকরের দরজা ছাড়া মসজিদে আর যত দরজা রয়েছে, সব বন্ধ করে দাও।'

আল্লামা ইবনু হিব্বান রাহ, এ হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন, 'এ হাদিসে স্পষ্টভাবে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূল (ﷺ) এর পর আবু বকর (রা.)-ই খলিফা হবেন।' [ফাতহুল বারী]

২ রবিউল আউয়াল সোমবার। সে দিন আবু বকর রা. এর ইমামতিতে লোকেরা ফজরের নামাজ পড়ছিলেন। এ সময় হঠাৎ করে রাসূল (ﷺ) এর আয়েশা রা.-এর কক্ষের পর্দা সরিয়ে লোকদের নামাজ পড়তে দেখে মুচকি হাসেন। আবু বকর রা. বিষয়টি টের পেয়ে পেছনে সরে আসতে লাগলেন। তখন আনন্দের আতিশয্যে সাহাবিদের মনও নামাজের মধ্যেই বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

এ অবস্থা দেখে রাসূল (ﷺ) হাতের ইশারায় নামাজ চালিয়ে যেতে বলেন। এরপর তিঁনি পর্দা ফেলে ঘরের ভেতরে চলে যান। এ ঘটনার পর তিঁনি আর কখনো বাইরে বের হননি। সে দিন জোহরের নামাজের পর রাসূল (ﷺ) এর দুনিয়ার এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে রাফিকে আলার সঙ্গে মিলিত হন। সহিহ বুখারির বর্ণনা অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

রাসূল (ﷺ) এর শেষ কথা

আয়েশা রা. বলেন, অসুস্থতার সময় রাসূল (ﷺ) কখনো কখনো চেহারা মুবারক থেকে চাদর সরিয়ে বলতেন, 'ই*য়াহুদি ও খ্রি*ষ্টানদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ এ জন্য এসেছে যে, তারা তাদের নবিদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়েছে।' এটা বলার উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিমরা যেন এ কাজ থেকে বিরত থাকে।

[সহীহ বুখারী]

আফসোস! রাসূল (ﷺ) তাঁর জীবনের অন্তিমশয্যায় যেসব বিষয়ের ভয় করছিলেন, সেসব কাজ থেকে মুসলিমরা বিরত থাকেনি। অলি ও নেক বান্দাদের কবরসমূহকে তারা সিজদার স্থান বানিয়েছে।

আয়েশা রা. বলেন, 'মৃ*ত্যুশয্যায় রাসূল (ﷺ) আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন, "হে আল্লাহ, আমি উর্ধ্বজগতের বন্ধুকে পছন্দ করি।"

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে الصلاة الصلاة শব্দগুলো উচ্চারিত হতো। যতক্ষণ তাঁর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, ততক্ষণ এ শব্দগুলো উচ্চারিত হচ্ছিল।

রাসূল (ﷺ) এর ই*ন্তেকালের সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন সাহাবিদের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। সবাই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁরা রাসূল (ﷺ) এর মৃ*ত্যু সংবাদ আদৌ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। উমর রা. এর মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আর শক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি শোকের আতিশয্যে রাসূল (ﷺ) এর ই*ন্তেকালে বিষয়টি অস্বীকার করে বসেন। আবু বকর রা. তখন সেখানে গিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি প্রথমে নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন,

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوۡلٌ ۚ قَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَا۠ئِنۡ مَّاتَ اَوۡ قُتِلَ انۡقَلَبۡتُمۡ عَلٰۤی اَعۡقَابِکُمۡ ؕ وَ مَنۡ یَّنۡقَلِبۡ عَلٰی عَقِبَیۡهِ فَلَنۡ یَّضُرَّ اللّٰهَ شَیۡـًٔا ؕ وَ سَیَجۡزِی اللّٰهُ الشّٰکِرِیۡنَ ﴿۱۴۴﴾

'মুহাম্মাদ একজন রাসুলমাত্র। তাঁর আগেও বহু রাসুল গত হয়েছেন। সুতরাং তিনি যদি মা*রা যান অথবা নি*হত হন, তাহলে কি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না; বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।'

[সূরা আল-ইমরান : ১৪৪]

তোমাদের যারা মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপাসনা করতে তারা শোনো, মুহাম্মাদ (ﷺ) ই*ন্তেকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহর উপাসনা করতে তোমরা শোনো, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর কখনো মৃ*ত্যু হবে না।

সাহাবিরা তখন ধীরে ধীরে হুঁশে আসতে থাকেন। অনেকের মনে হচ্ছিল আয়াতটি এইমাত্র যেন নাজিল হচ্ছে।

রাসূল (ﷺ) এর ই*ন্তেকালের পর প্রথম জরুরি কাজ ছিল, তাঁর খলিফা (প্রতিনিধি) নির্বাচন করা। কেননা, ধর্মীয় ও জাগতিক সব কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটা এবং ভেতর ও বাইরের শত্রুদের

আক্রমণের আশঙ্কা ছাড়াও রাসূল (ﷺ) এর কাফন-দাফনের ব্যাপারেও মতবিরোধের সমূহ আশঙ্কা ছিল। ফলে সাহাবিরা রাসূল (ﷺ) এর কাফন-দাফনের আগেই খলিফা নির্বাচনকে জরুরি মনে করেন। এ জন্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে কিছু সময়ও লেগে যায়। তাই সোমবার তিনি ই*ন্তেকাল করলেও বুধবার পর্যন্ত কাফন-দাফনের কাজ মুলতুবি করা হয়।

মুহাজিররা তখন জড়ো হচ্ছিলেন আবু বকর রা. এর আর আনসাররা সাকিফায়ে বনু সায়িদায় সাআদ ইবনু উবাদা রা. এর পাশে। আবু বকর রা. বিষয়টি জানতে পেরে উমর রা. ও আবু আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. সহ নেতৃস্থানীয় কতিপয় মুহাজিরকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যান সাকিফায়ে বনু সায়িদায়। সেখানে পৌঁছার পর আলোচনার একপর্যায়ে আবু বকর রা. এর হাতে সবাই খিলাফতের বায়আত হন।

বুধবার রাতে আলি রা., আব্বাস রা. এবং আরও কয়েকজন রাসূল (ﷺ) কে গোসল দিয়ে কাফন পরান। এরপর জানাজার নামাজ পড়া হয়। বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল (ﷺ) এর কবর আয়েশা রা. এর ঘরের সে স্থানটিতে খনন করা হয়, যেখানে তাঁর ই*ন্তেকাল হয়েছে। আবু তালহা রা. রাসূল (ﷺ) এর কবর খনন করেন এবং আলি রা. ও আব্বাস রা. প্রমুখ রাসূল (ﷺ) এর লাশ মুবারক কবরে রাখেন। কবরটি এক বিঘত পরিমাণ উঁচু রাখা হয়।

অধ্যায় ৭:নবিজীর পরিবার,গুন ও আখলাক

নবীজির পবিত্র স্ত্রীগণ

নবি ﷺ -এর স্ত্রীদের বলা হয় উম্মাহাতুল মুমিনীন বা বিশ্বাসীদের মা। নবি ﷺ -এর এগারো কি বারো স্ত্রী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন নয়জন ।আর বাকি দুই জন বা তিন জন নবিজির জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। প্রত্যেকের ব্যাপারে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

১. খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রা.)

তাঁর জীবদ্দশায় রাসূল (ﷺ) অন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করেননি।হিজরতের তিন বছর আগে ৬৫ বছর বয়সে-তখন রাসূল (ﷺ) এর বয়স ছিল ৪৯ বছর-তিনি ই*ন্তে/কাল করেন। একই বছর আবু তালিবও মারা যান। তাই এ-বছরকে 'আমুল হুজন' বা 'শোকের বছর' বলা হয়।

খাদিজা রা. এর ই*ন্তে/কালের পর রাসূল (ﷺ) আরও কয়েকজন সচ্চরিত্র মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁরা হচ্ছেন: ২. সাওদা বিনতু জামআ রা., ৩. আয়েশা বিনতু আবু বকর রা., ৪. হাফসা বিনতু উমর রা., ৫. জায়নাব বিনতু খুজায়মা রা., ৬. উম্মু সালামা রা., ৭. জায়নাব বিনতু জাহাশ রা., ৮. জুওয়াইরিয়া রা., ৯. উম্মু হাবিবা রা., ১০. সাফিয়া রা., ১১. মাইমুনা রাজিআল্লাহু আনহুম.।

২.সাওদা বিনতু জামআ (রা.)

খাদিজা রা. এর ই*ন্তে/কালের পর রাসূল (ﷺ) সাওদা বিনতু জামআ রা. কে বিয়ে করেন। এর আগে তিনি সাকরান ইবনু আমরের বিয়েবন্ধনে আবন্ধ ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত করেন। হাবশার মুহাজিরদের সঙ্গে মক্কায় ফেরার পর সাওদার স্বামী মারা যান। এরপর রাসূল (ﷺ) তাঁকে বিয়ে করেন। উমর রা.-এর খিলাফতকালের শেষ দিকে তিনি ই/ন্তে*কাল করেন।তাঁর থেকে পাঁচটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সহিহ বুখারিতে একটি ও সুনানু আরবাআতে চারটি।

৩.আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শাওয়ালে আয়েশা রা. জন্ম নেন; আর দশম বছরে রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। এর তিন বছর পর তাঁর নয় বছর বয়সে এবং রাসূল (ﷺ) এর মদিনায় হিজরতের সাত মাস পর প্রথম হিজরির শাওয়ালে তাঁর বাসর হয়।আয়েশা রা. হলেন রাসূল (ﷺ) এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। তাঁর ১৮ বছর বয়সে রাসূল (ﷺ) ই/ন্তে*কাল করেন। মাত্র নয় বছরের নবি সাহচর্য তাঁর ওপর কী প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তিনি কতটুকু অর্জন করেছিলেন, তা সাহাবিদের বিভিন্ন কথা থেকে সহজেই বোঝা যায়।

৩.তিনি ছিলেন উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকিহ নারী এবং নারীদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী। বড় বড় সাহাবি তাঁর ফাতওয়া গ্রহণ করতেন। তিনি ২ হাজার ২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।তাঁর সম্পর্কে সাহাবিরা বলতেন, 'কোনো মাসআলায় আমাদের সন্দেহ হলে আমরা আয়েশা রা. কে জিজ্ঞেস করলে সমাধান পেয়ে যেতাম।' এ কারণে প্রসিদ্ধ অনেক সাহাবি তাঁর শিষ্য ছিলেন। ৫৮ হিজরির ১৭ রমজানে ৬৭ বছর বয়সে তিনি ই/ন্তে*কাল করেন।

৪.হাফসা বিনতু উমর (রা.)

নবুওয়াতের পাঁচ বছর আগে তিনি জন্ম নেন। তাঁর পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব রা., মা জায়নাব বিনতু মাজউন রা.। প্রথমে খুনায়িস ইবনু হুজাফা সাহমি রা.-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এরপর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় হিজরিতে রাসূল (ﷺ) তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর থেকে ৬০টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ৪৫ হিজরিতে মদিনায় তিনি ই/ন্তে*কাল করেন।

৫. জায়নাব বিনতু খুজায়মা হিলালিয়া (রা.)

তিনি 'উম্মুল মাসাকিন' বা 'নিঃস্বদের মা' নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথমে তাঁর বিয়ে হয় তুফায়িল ইবনু হারিসের সঙ্গে কিন্তু এক পর্যায়ে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এরপর তুফায়িলের ভাই উবায়দা রা. তাঁকে বিয়ে করেন। বদরযুদ্ধে উবায়দা রা. শহিদ হলে রাসূল (ﷺ) তাঁকে বিয়ে করেন।তাঁর সঙ্গে বিয়ের মাত্র দু-মাস পর তিনি ই/ন্তে*কাল করেন।

৬. উম্মু হাবিবা বিনতু আবু সুফিয়ান (রা.)

তিনি আবু সুফিয়ান রা.-এর মেয়ে। তাঁর প্রথম বিয়ে হয় উবায়দুল্লাহ ইবনু জাহাশের সঙ্গে। উবায়দুল্লাহর ঔরসে তাঁর সন্তানও হয়। তাঁরা উভয়ে ইসলামগ্রহণ করে হাবশায় হিজরতও করেন। হাবশায় যাওয়ার পর উবায়ল্লাহ খ্রি/ষ্টান হয়ে যায়। তবে উম্মু হাবিবা নিজের ইমানে অটল থাকেন। তখন রাসূল (ﷺ) হাবশার বাদশাহ নাজাশিকে চিঠি লিখে জানান, তিনি যেন রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। রাসূল (ﷺ) এর চিঠি পেয়ে বাদশাহ উম্মু হাবিবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং ৪০০ দিনার মোহর তাঁর পক্ষ থেকে আদায় করেন। বিয়েতে তাঁর অভিভাবক ছিলেন খালিদ ইবনু সায়িদ ইবনুল আস রা.। ৪৪ হিজরিতে তিনি ই/ন্তে*কাল করেন। তাঁর থেকে মোট ৬৫টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

৭. উম্মু সালামা (রা.)

তাঁর নাম হিন্দা। প্রথমে তাঁর বিয়ে হয় আবু সালামা ইবনু আবদুল আসাদের সঙ্গে। তাঁদের সন্তানাদিও হয়। স্বামীর সঙ্গে তিনি হাবশা ও মদিনায় হিজরত করেন। তৃতীয় অথবা চতুর্থ হিজরির জামাদিউস সানিতে রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ৩৭৮টি হাদিস তিনি বর্ণনা

করেছেন। কারও মতে ৬৩ হিজরিতে ৮৪ বছর বয়সে তিনি ই/ন্তে*কাল করেন।বলা হয়ে থাকে, উম্মাহাতুল মুমিনিনের মধ্যে তিনিই সবার শেষে ই/ন্তে*কাল করেন।

৮. জায়নাব বিনতু জাহাশ (রা.)

জায়নাব বিনতু জাহাশ রা. রাসূল (ﷺ) এর ফুফাতো বোন। তাঁর মা উমায়মা বিনতু আবদুল মুত্তালিব। রাসূল (ﷺ) এর আদেশে তিনি জায়েদ ইবনু হারিসা রা. এর সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন। জায়েদ রা. ছিলেন নবিজির আজাদকৃত দাস। আজাদের পর তাঁকে নিজের পালক ছেলে করেন রাসূল (ﷺ)। জায়েদ যেহেতু 'দাস' ছিলেন, তাই বংশ-গৌরবের কারণে জায়নাব রা. এ বিয়েকে আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। শুধু রাসূল (ﷺ) এর আদেশ পালনার্থে বিয়েতে তিনি রাজি হয়েছিলেন। এভাবে প্রায় এক বছর তিনি তাঁর স্ত্রী হিসেবে ছিলেন; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেহেতু হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বা মানসিক বনিবনা হচ্ছিল না, ফলে সবসময় মনোমালিন্য লেগেই থাকত। এমনকি স্ত্রীর মানসিক অস্থিরতার বিষয়টি বুঝতে পেরে খোদ জায়েদ রা. রাসূল (ﷺ) এর কাছে স্ত্রী জায়নাব রা. কে তালাক প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকেন। তবে রাসূল (ﷺ) তাঁকে বুঝিয়ে তা থেকে বিরত রাখতেন। এতকিছুর পরও যখন তাঁদের মধ্যে বনিবনা হয়নি, তখন জায়েদ রা. বাধ্য হয়ে তাঁকে তালাক দেন।

জায়নাব রা. যখন জায়েদ রা. এর বাহুডোর থেকে মুক্ত হন, তখন রাসূল (ﷺ) তাঁর সান্ত্বনা ও মনোস্তুষ্টির জন্য তাঁকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় অন্য একটি বিষয়! তখন আরবসমাজে পালকপুত্রকে ঔরসজাত সন্তানের মতো মনে করা হতো। তাই সমাজের সাধারণ মানুষের মনোভাব প্রত্যক্ষ করে রাসূল (ﷺ) তাঁকে আপাতত বিয়ে করা থেকে বিরত থাকেন। কেননা, তখন হয়তো মানুষ এটা বলাবলি করত যে, তিনি তাঁর পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন। কিন্তু এটা যে জাহিলি যুগের একটা কুসংস্কার এবং তা নির্মূল করা ইসলামের অপরিহার্য দায়িত্ব, সুতরাং এই কুধারণা মিটিয়ে দিতে আল্লাহ তাআলা কুরআনের একটি আয়াত নাজিল করেন,

وَ اِذۡ تَقُوۡلُ لِلَّذِیۡۤ اَنۡعَمَ اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡهِ اَمۡسِکۡ عَلَیۡکَ زَوۡجَکَ وَ اتَّقِ اللّٰهَ وَ تُخۡفِیۡ فِیۡ نَفۡسِکَ مَا اللّٰهُ مُبۡدِیۡهِ وَ تَخۡشَی النَّاسَ ۚ وَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنۡ تَخۡشٰهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰی زَیۡدٌ مِّنۡهَا وَطَرًا زَوَّجۡنٰکَهَا لِکَیۡ لَا یَکُوۡنَ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ حَرَجٌ فِیۡۤ اَزۡوَاجِ اَدۡعِیَآئِهِمۡ اِذَا قَضَوۡا مِنۡهُنَّ وَطَرًا ؕ وَ کَانَ اَمۡرُ اللّٰهِ مَفۡعُوۡلًا ﴿۳۷﴾

আর স্মরণ কর, আল্লাহ যার উপর নিআমত দিয়েছিলেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলে, তুমি যখন তাকে বলেছিলে 'তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর'। আর তুমি অন্তরে যা গোপন রাখছ আল্লাহ তা প্রকাশকারী এবং তুমি মানুষকে ভয় করছ অথচ আল্লাহই অধিকতর হকদার যে, তুমি তাকে ভয় করবে; অতঃপর যায়েদ যখন তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে; যখন তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহসম্পর্ক ছিন্ন করে। আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়ে থাকে।

[সূরা আহজাব : ৩৭]

চতুর্থ হিজরি, কোনো বর্ণনায় তৃতীয় অথবা পঞ্চম হিজরিতে আল্লাহর আদেশে রাসূল (ﷺ) তাঁকে বিয়ে করেন। মানুষ যাতে এটা বুঝতে পারে যে, পালকপুত্র ঔরসজাত পুত্রের মতো নয়; এমনকি পালকপুত্রের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে গেলে তার স্ত্রীকে বিয়ে করা পালক পিতার জন্য হারাম নয়। যারা আল্লাহর হালাল এ বিধানকে আকিদা ও আমলের ক্ষেত্রে হারাম করে রেখেছে, তারা যেন ভবিষ্যতে এমনটা আর না করে। জাহিলি যুগের এই কুসংস্কারের ধারাও যেন চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু এই প্রাচীন কুপ্রথা তখনই বন্ধ করা সম্ভব ছিল, যখন রাসূল (ﷺ) নিজেই কার্যক্ষেত্রে সেটা বাস্তবায়ন করে দেখাবেন।
জায়নাব বিনতু জাহাশ রা. ২০ হিজরিতে মদিনায় ই/ন্তে*কাল করেন। তাঁর থেকে নয়টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।
৯. সাফিয়া বিনতু হুয়াই (রা.)

সাফিয়া বিনতু হুয়াই রা. প্রথমে কিনানা ইবনু আবিল হুকাইকের স্ত্রী ছিলেন। মুসলিমরা সপ্তম হিজরিতে খায়বার বিজয় করলে কিনানা সে যুদ্ধে নিহত হয় এবং সাফিয়া যুদ্ধবন্দি হয়ে মদিনায় আসেন। অথচ তিনি ছিলেন কুরায়জা ও নাজির উভয় গোত্রের সরদারের মেয়ে এবং হারুন আ.-এর বংশধর। এটা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি এক নবির বংশধর আর আরেক নবির স্ত্রী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে জানতে পেরে রাসূল (ﷺ) তাঁকে মুক্ত করে বিয়ে করেন।তিনি মোট ১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। ৫০ হিজরির রমজানে তাঁর ই/ন্তে*কাল হয়।

১০. জুওয়াইরিয়া বিনতু হারিস খুজাইয়া(রা.)

তিনি বনু মুসতালিকের সরদার হারিসের মেয়ে। যুদ্ধবন্দি হিসেবে রাসূল (ﷺ) এর কাছে আসেন। পরে রাসূল (ﷺ) তাঁকে মুক্ত করে বিয়ে করেন। তিনি তাঁকে বিয়ে করায় তাঁর গোত্রের সবাই মুক্তি পায় এবং তাঁর পিতা মুসলমান হন। জুওয়াইরিয়া ৫০ হিজরিতে ই/ন্তে*কাল করেন। তাঁর থেকে পাঁচটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

১১. মাইমুনা বিনতু হারিস হিলালিয়া (রা.)

তিনি প্রথমে মাসউদ ইবনু উমরের স্ত্রী ছিলেন। সে তাঁকে তালাক দেওয়ার পর আবু রিহামের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আবু রিহামের মৃত্যুর পর সপ্তম হিজরিতে রাসূল (ﷺ) তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি নবিজির শেষ স্ত্রী। ৫১ হিজরিতে তিনি ই/ন্তে*কাল করেন। তাঁর থেকে ৭৬টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল (ﷺ) এর বহুবিয়ে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকা ইসলামপূর্ব যুগের প্রায় সব ধর্মেই স্বীকৃত একটি বিষয় ছিল। আরব, হি/ন্দুস্থান, ইরান, মিসর, গ্রিস, ব্যাবিলন, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি দেশে বসবাসকারী জাতিসমূহের মধ্যে বহুবিয়ের প্রচলন ছিল। তা ছাড়া এই প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয়তার কথা আজও কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। বর্তমানে ইউরোপীয়রা তাদের পূর্বপুরুষের বিরুদ্ধে বহুবিয়েকে অবৈধ ঘোষণার প্রয়াস চালিয়েছে, যদিও তারা সফল হতে পারেনি; বরং ইউরোপ-আমেরিকায় আজও বহুবিয়ের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। প্রখ্যাত খ্রি/স্টান পণ্ডিত মি. ডেবিন পোর্ট (Mr. Debian Port) বহুবিয়ের পক্ষে ইনজিল কিতাবের অনেক আয়াত উল্লেখের পর লিখেছেন, 'এসব আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে, বহুবিয়ে যে শুধু পছন্দনীয় তা নয়; বরং আল্লাহ তাতে অনেক বরকতও দিয়েছেন। এমনিভাবে পাদরি ফিকস, জন মিলটসন, আইজ্যাক টেলরসহ অনেকেই বহুবিয়ের পক্ষে জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন।তবে লক্ষণীয় যে, ইসলামপূর্ব যুগে বহুবিয়ের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না; ফলে একজন পুরুষের অধীনে হাজার হাজার মহিলা থাকত। এ ছাড়া খ্রি/স্টান পাদরিরা সাধারণত বহুবিয়েতে অভ্যস্ত ছিল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত জার্মানিতে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। কনস্টান্টিনোপল সম্রাট ও তার উত্তরাধিকারীদের সবারই অসংখ্য স্ত্রী ছিল। তেমনিভাবে হি/ন্দুদের বেদগ্রন্থের শিক্ষায়ও

বহুবিয়ের বিষয়টি বৈধ ছিল। বেদের শিক্ষানুযায়ী একই সময়ে ১০ জন, ১৩ জন, ২৭ জন স্ত্রী রাখার অনুমতি রয়েছে।(৫৮)মোটকথা, ইসলামপূর্ব যুগে একাধিক বিয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল, তবে সংখ্যার ক্ষেত্রে কোনো সীমারেখা ছিল না। বিভিন্ন ধর্ম ও দেশের ইতিহাস পড়ে জানা যায়, ই/য়াহুদি, খ্রি/ষ্টান, আর্য, হি/ন্দু, বৌ/দ্ধ, পারসিক কোনো ধর্ম বা আইনে বহুবিয়ের কোনো সীমা নির্ধারিত ছিল না। এমনকি ইসলামের শুরু-যুগেও বহুবিয়ের এ প্রথা নির্ধারিত কোনো সংখ্যার ওপর স্থির ছিল না, ফলে অনেক সাহাবির অধীনে তখন চারের অধিক স্ত্রী ছিলেন। তবে খাদিজা রা.-এর ইনতিকালের পর ইসলামের বিশেষ প্রয়োজনে রাসূল (ﷺ) এর বিয়েবন্ধনে একসঙ্গে ১০ জন পর্যন্ত স্ত্রী ছিলেন।এরপর যখন দেখা গেল, বহুবিয়ের ফলে মহিলাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। মানুষ প্রথমে লোভের বশবর্তী হয়ে অনেক বিয়ে করে ফেলত। এরপর তাদের সবার চাহিদা ও অধিকার ঠিকমতো পূরণ করতে পারত না। এসব বিষয় লক্ষ করেই পবিত্র কুরআনের চিরন্তন বিধান, যা পৃথিবী থেকে সর্বপ্রকার জুলুম-অত্যাচার উচ্ছেদের জন্যই নাজিল হয়েছে-মানুষের স্বভাবজাত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে বহুবিয়েকে একেবারে নিষেধ করেনি ঠিক; তবে একে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে বহুবিয়ের ফলে যেসব ক্ষতি পরিলক্ষিত হতো, সেসবও দূর করে দিয়েছে।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এল যে, 'এখন থেকে তোমরা শুধু চারজন নারীকে একই সময়ে বিয়ে করতে পারবে। আর তা-ও এই শর্তে যে, যদি তোমরা চারজন স্ত্রীর অধিকার সমানভাবে আদায় করতে সক্ষম হও। আর যদি এর (তথা সুবিচার ও সমতাবিধানের) সাহস ও ক্ষমতা না থাকে, তাহলে একের অধিক স্ত্রী রাখা অন্যায় ও জুলুম।'এ ঘোষণার মাধ্যমে একই সময় চারের অধিক স্ত্রী রাখা উম্মতের সর্বসম্মত মতানুযায়ী হারাম হয়ে গেছে। তখন যে-সকল সাহাবির অধীনে চারজনের অধিক স্ত্রী ছিলেন, তাঁরা নবিজির নির্দেশে চারজন রেখে বাকিদের তালাক দিয়ে দেন।গায়লান রা. যখন মুসলমান হন, তখন তাঁর ১০ জন স্ত্রী ছিলেন। রাসূল (ﷺ)ও তাঁকে নির্দেশ দেন, চারজন রেখে বাকিদের তালাক দিয়ে দাও। অনুরূপভাবে নাওফাল ইবনু মুআবিয়া রা. যখন ইসলামগ্রহণ করেন, তখন তাঁর পাঁচজন স্ত্রী ছিলেন। রাসূল (ﷺ) তাঁকেও চারজন রেখে একজনকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেন।এই সাধারণ নিয়ম ও বিধান অনুযায়ী রাসূল (ﷺ) পূতপবিত্র স্ত্রীর সংখ্যাও চারের অধিক না হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু এখানে এটাও স্পষ্ট যে, উম্মাহাতুল মুমিনিন বা নবিপত্নীগণ অন্যান্য নারীর মতো নন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে,يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِহে নবিপত্নীরা, তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। [সুরা আহযাব: ৩২]

রাসূল (ﷺ) এর পূতপবিত্র স্ত্রীগণ হলেন উম্মতের মা। তাই রাসূল (ﷺ) এর পর তাঁরা অন্য কারও সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন না। এখন যদি সাধারণ নিয়মানুযায়ী চারজনের

অতিরিক্ত স্ত্রীদের তালাক দিয়ে পৃথক করে দেওয়া হতো, তাহলে তাঁদের ওপর কতই-না অবিচার করা হতো। সারাটি জীবন তাঁদের নিঃসঙ্গ হয়ে কাটাতে হতো। রাহমাতুল্লিল আলামিনের সঙ্গে কিছুদিনের সহাবস্থান তাঁদের জন্য এক বিরাট কষ্টে পরিণত হতো। একদিকে তাঁরা রাসূল (ﷺ) এর সাহচর্য থেকে মাহরুম হয়ে যেতেন, অপরদিকে অন্য কোথাও এই দুঃখ মোচনের অনুমতিও তাঁদের থাকত না। এ জন্য তাঁদেরকে সাধারণ এ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা কোনোভাবেই সংগত ছিল না। বিশেষ করে সে-সকল নারী, যাঁদের বিয়ে শুধু এ কারণেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে, তাঁদের স্বামীরা জি/হা*দের ময়দানে শহিদ হওয়ায় তাঁরা সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই রাসূল (ﷺ) তাঁদের বিয়ে করেছিলেন। এখন যদি তাঁদের তালাক দিয়ে দেওয়া হতো, তাহলে তাহলে তাঁদের অবস্থাটা কী দাঁড়াত? এটা কি কোনো উত্তম সহমর্মিতা হতো যে, এখন তাঁরা গোটা জীবনের জন্য বিয়েবঞ্চিত হয়ে গেলেন?এসব কারণে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী চারের অধিক স্ত্রী রাখা শুধু রাসূল (ﷺ) এর বিশেষত্ব গণ্য হয়। এ ছাড়া রাসূল (ﷺ) এর ঘরোয়া জীবনের অবস্থাসমূহ, যা উম্মতের জন্য দীনি ও দুনিয়াবি সর্বক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ আদর্শ হিসেবে গণ্য, তা শুধু তাঁর স্ত্রীগণের মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছতে পারত। আর এটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে, নয়জন নারীও সে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এসব বাস্তব অবস্থা সমানে রেখে কেউ কি এ কথা বলতে পারে যে, রাসূল (ﷺ) এর এ বিশেষত্ব (আল্লাহ ক্ষমা করুন) জৈবিক কোনো লালসার কারণে ছিল?এর পাশাপাশি এ বিষয়টিও লক্ষণীয়, যে সময়ে সমগ্র আরব-অনারব রাসূল (ﷺ) এর বিরোধিতার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল, তাঁর ওপর নানা অপবাদ আরোপ করছিল; এককথায়, এই দেদীপ্যমান সূর্যের গায়ে কাদা নিক্ষেপের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল। এসব কিছুই তারা করল কিন্তু কোনো কা/ফিরও কি কখনো তাঁর সম্পর্কে জৈবিক চাহিদা বা নারীঘটিত ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করেছে? অবশ্যই না। এ ক্ষেত্রে অপবাদ আরোপের সামান্যতম সুযোগও তারা পায়নি। নতুবা বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির দুর্নাম রটাতে এর চেয়ে বড় হাতিয়ার আর কী হতে পারত! যদি সামান্য অবকাশ থাকত, তাহলে আরবের কাফিররা-যাদের কাছে রাসূল (ﷺ) এর ঘরের কোনো খবরও গোপন ছিল না-তিলকে তাল বানিয়ে এটাকে তাঁর দোষ হিসেবে গণ্য করত। কিন্তু তারা এতটা বোকা ছিল না যে, বাস্তবতা অস্বীকার করে নিজের কথার ওজন কমাবে।আল্লাহ ভীরুতার মূর্তপ্রতীক রাসূল (ﷺ) এর পবিত্র জীবন সর্বসাধারণের চোখের সামনে উপস্থিত ছিল। তারা দেখতে পাচ্ছিল যে, তাঁর যৌবনের বড় অংশই একাকিত্ব ও নির্জনতায় কেটেছে। এরপর তাঁর বয়স যখন ২১ (প্রসিদ্ধ মতে ২৫), তখন খাদিজা রা. এর পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে-যিনি বিধবা ও সন্তানবতী ছিলেন এবং জীবনের দীর্ঘ ৪০টি বছর অতিক্রম করে তখন বার্ধক্যের দুয়ারে পা রেখেছেন। রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে বিয়ের আগে

তিনি আরও দুজন স্বামীর সংসার করেছিলেন এবং দুই পুত্র ও তিন মেয়ের জননী ছিলেন।রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। তাঁর সঙ্গেই রাসূল (ﷺ) তাঁর যৌবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেন; আর জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁর সঙ্গে কাটানোর ফলে রাসূল (ﷺ) এর সকল সন্তানই তাঁর গর্ভে জন্মান।অবশ্য খাদিজা রা. এর ই/ন্তে*কালের পর রাসূল (ﷺ) এর বয়স পঞ্চাশের কোটা পেরোলে তিনি আরও কয়েকটি বিয়ে করেন এবং শরয়ি বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে ১০ জন পর্যন্ত মহিলা তাঁর বিয়েতে আবদ্ধ হন। আয়েশা রা. ছাড়া যাঁদের সবাই বিধবা এবং কেউ কেউ সন্তানবতীও ছিলেন।এসব পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ রেখে আমি এটা ধারণাও করতে পারি না যে, কোনো সুস্থ বিবেকের মানুষ রাসূল (ﷺ) এর এই বহুবিয়েকে (নাউজুবিল্লাহ) জৈবিক ভোগ- লালসার পরিণতি বলে মন্তব্য করতে পারে! বাঁকা চোখবিশিষ্ট কেউ যদি নবুওয়াতের জ্যোতি ও মাহাত্ম্য দেখতে না পায় এবং তাঁর চরিত্র, কাজ, আল্লাহ ভীরুতা, পবিত্রতা, দুনিয়াবিমুখতা, সাধনা এবং জীবনের খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয় থেকেও চোখ বন্ধ করে রাখে, তবু এই বহুবিয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটনা প্রবাহই তাকে এ কথা বলতে বাধ্য করবে যে, এসব বিয়ে নিশ্চয় জৈবিক কোনো চাহিদার কারণে ছিল না। যদি এমন হতো, তাহলে সারাটা জীবন একজন বৃদ্ধার সঙ্গে অতিবাহিত করে প্রায় ৫৫ বছর বয়সকে এ কাজের জন্য মনোনীত করা কোনো মানুষের বিবেক মেনে নিতে পারে না। বিশেষ করে যখন আরব ও কুরাইশের নেতারা রাসূল (ﷺ) এর একটিমাত্র ইশারায় নিজেদের নির্বাচিত রূপসি ও সুন্দরী মেয়েকে তাঁর চরণে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল। সিরাত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।এ ছাড়া মুসলিমদের সংখ্যাও তখন লাখের কোটায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং প্রত্যেক মহিলাই রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গী হয়ে উভয় জগতের সফলতা ও কল্যাণ লাভ করতে চাইতেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জীবনের প্রায় ৫০ বছর শুধু খাদিজা রা. এর সঙ্গেই কাটিয়ে দেন; অথচ বিয়ের সময়ই খাদিজা রা. এর বয়স ছিল ৪০ বছর। খাদিজা রা. এর ই/ন্তে*কালের পর তিনি যে-সকল নারীকে বিয়ে করেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া সবাই ছিলেন বিধবা এবং সন্তানের জননী। উম্মতের অসংখ্য কুমারী মেয়ে থাকা সত্ত্বেও রাসূল (ﷺ) তাঁদের বিয়ে করেননি।এই ছোট গ্রন্থে (সিরিজে) এর চেয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। নাহয় দেখিয়ে দেওয়া যেত যে, রাসূল (ﷺ) এর বহুবিয়ে কতটা ইসলাম ও শরয়ি প্রয়োজনে ছিল। বস্তুত যদি নবি- সহধর্মিনীগণ না হতেন, তাহলে সেসব বিধান-যা শুধু নারীদের মাধ্যমেই উম্মতের কাছে পৌঁছানো সম্ভব ছিল-অজানাই থেকে যেত। কাজেই রাসূল (ﷺ) এর বহুবিয়েকে জৈবিক লালসা আখ্যা দেওয়া নিতান্ত নির্লজ্জতা ও সত্যবিরুদ্ধ বিষয়। অন্যায়প্রীতি যদি বিবেক-বুদ্ধিকে লোপ করে না দেয়, তাহলে কোনো কা/ফিরও এমনটি বলতে পারে

না।রাসূল (ﷺ) নয়জন পূতপবিত্র স্ত্রী রেখে ই/ন্তে*কাল করেন। তাঁর ই/ন্তে*কালের পর প্রথমে জায়নাব বিনতু জাহাশ রা. এবং সব শেষে উম্মু সালামা রা. ই/ন্তে*কাল করেন।

নবিজি ﷺ-এর সন্তানসন্ততি

আগেই বলা হয়েছে ইব্রাহিম ছাড়া নবীজি ﷺ-এর বাকি সব সন্তান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার গর্ভজাত ।তাদের ব্যাপারে সংক্ষেপে উল্লেখ করে হলো।

রাসূল (ﷺ) এর চার কন্যা

১. ফাতিমা (রা.)

এ বিষয়ে উম্মাহর সবাই একমত যে, নবিকন্যাদের মধ্যে ফাতিমা রা. মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। খোদ রাসূল (ﷺ) তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, 'ফাতিমা জান্নাতি মহিলাদের সরদার।'

দ্বিতীয় হিজরির জিলহজে আলি (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়েতে ৪৮০ দিরহাম বা প্রায় ১৫ ভরি ওজনের রুপার সমান মোহর হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল। ফাতিমা (রা.) এর বিয়ের সময় রাসূল (ﷺ) তাঁর সঙ্গে যেসব জিনিসপত্র দিয়েছিলেন, সেগুলো হচ্ছে: একটি চাদর, খেজুরের ছালভরতি একটি বালিশ, চামড়ার একটি গদি, দড়ির একটি খাট, চামড়া নির্মিত একটি পানির পাত্র এবং আটা পেষার একটি চাক্কি।
ফাতিমা রা. ঘরের সব কাজকর্ম নিজ হাতেই করতেন।

এই হচ্ছে জান্নাতি মহিলাদের সরদার, নবি দুলালি ফাতিমা রা.-এর বিয়ে, মোহর, জাহিজ বা উপহারের বিবরণ এবং তাঁদের দীনতাপূর্ণ জীবনের বাস্তব চিত্র। এসব দেখে কি সে-সকল নারী লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হবে না, যারা বিয়ে-শাদিতে অনৈসলামিক বিভিন্ন প্রথা পালন করতে গিয়ে নিজেদের দীন ও দুনিয়া উভয়টাই নষ্ট করে দেন।
রাসূল (ﷺ) এর তিনজন পুত্র সন্তানের কেউ-ই বেঁচে থাকেননি। এতে হয়তো আল্লাহর অপার কোনো রহস্য রয়েছে। ফলে শুধু কন্যা সন্তানের মাধ্যমেই রাসূল (ﷺ) এর বংশধারা বিস্তৃত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আবার শুধু ফাতিমা রা.-এর সন্তানরাই দীর্ঘজীবন লাভ করেন। অন্য কারও কোনো সন্তানই হয়নি বা হলেও বেঁচে থাকেননি। ফাতিমার গর্ভে তিনজন ছেলে ও দুজন মেয়ে জন্মান- হাসান (রা.), হুসাইন (রা.) ও মুহসিন। মুহসিন ছোট থাকতেই মা/রা

যান। ফলে হাসান রা. ও হুসাইন রা. এর মাধ্যমে রাসূল (ﷺ) এর বংশধারা বিস্তার হয়েছে। তাঁর মেয়ে দুজন ছিলেন- উম্মু কুলসুম ও জায়নাব।

ফাতিমা রা. নবিজির মৃত্যুর ছয় মাসপর অর্থাৎ, ১১ হিজরির জামাদিউল উলার ১৩ তারিখে, ওয়াকিদির মতে ৩ রমজান; কারও মতে জামাদিউস সানির ৩ তারিখে ই/ন্তে*কাল করেন।

২. জায়নাব (রা.)

রাসূল (ﷺ) এর বয়স যখন ৩০ বছর (৬০১ খ্রিষ্টাব্দ), তখন তিনি জন্মান। রাসূল (ﷺ) তাঁকে আবুল আস ইবনু রাবির সঙ্গে বিয়ে দেন। তাঁর গর্ভে আলি নামে এক ছেলে আর উমামা নামে এক মেয়ে হয়। তবে আলি অল্পবয়সেই মা/রা যান। ফাতিমা রা.-এর ই/ন্তে*কালের পর আলি রা. উমামাকে বিয়ে করেন। তবে উমামার গর্ভে কোনো সন্তান হয়নি। জায়নাব রা. অষ্টম হিজরিতে ই/ন্তে*কাল করেন।

৩. রুকাইয়া (রা.)
রাসূল (ﷺ) এর বয়স যখন ৩৩ বছর, তখন রুকাইয়া রা. জন্মগ্রহণ করেন। উসমান রা.-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।উসমান রা. যখন হাবশায় হিজরত করেন, তখন রুকাইয়া রা.- ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। দ্বিতীয় হিজরিতে বদরের যুদ্ধ শেষে রাসূল (ﷺ) যখন মদিনায় ফিরছিলেন, তখন রুকাইয়া রা. নিঃসন্তান অবস্থায় ই/ন্তে*কাল করেন। তিনি দু-বার হিজরত করেছেন- প্রথমে হাবশায় এরপর মদিনায়।

৪. উম্মু কুলসুম (রা.)
তাঁর মূল নাম জানা যায়নি। তিনি 'উম্মু কুলসুম' (কলুসুমের মা) উপনামেই পরিচিত। রুকাইয়া রা. মারা যাওয়ার পর তৃতীয় হিজরিতে উসমান রা.-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এ জন্য উসমানের উপাধি ছিল 'জুননুরাইন' বা দুই নুরের অধিকারী। উম্মু কুলসুমের কোনো সন্তান হয়নি। তিনি নবম হিজরিতে ই/ন্তে*কাল করেন। তাঁর ই/ন্তে*কালের পর রাসূল (ﷺ) বলেন, 'আমার যদি আর কোনো মেয়ে থাকত, তবে তাকেও আমি উসমানের সঙ্গে বিয়ে দিতাম।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ৩ জন ছেলে ছিল
১) নবিজি ﷺ-এর জ্যেষ্ঠতম তনয় কাসিম রা.-এর নামানুসারে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উপনাম আবুল কাসিম ডাকা হতো।প্রায় ২বছর বয়সে তিনি মারা যান।

২) আবদুল্লাহ
৩) ইব্রাহিম

নবীজির চেহারা

নবি ﷺ-এর চেহারা ছিল উজ্জ্বল ফর্সা, আকর্ষণীয় ও গোলাকার।খুশি হলে তাদের মতো উজ্জ্বল হয়ে যেত তার মুখ মন্ডল,আর রাগের সময় দেখতে ডালিমের মতো লাল।

মুখ ঘেমে গেলে মনে হতো মুক্তাদানা। মিশকের চেয়েও বেশি সুঘ্রাণ ছিল তার ঘামের। নবিজির গাল নরম,কপাল প্রশস্ত ,ভ্রু চিকন ও বাঁকানো।টানা টানা চোখের মনি কালো ,আর সাদা অংশে ছিল লাল আভা।চোখের পাপড়ি লম্বা ও ঘন।দেখলে মনে হয় সুরমা লাগিয়েছেন কিন্তু বাস্তবে তিনি তো ব্যবহার করেননি।

নাকের অগ্রভাগ উঁচু ও চকচকে। চওড়া মুখের সামনে দুটি দাঁতের মাঝে একটু ফাঁক ছিল এবং বাকি দাঁতগুলো একটি অপরটি থেকে আলাদা ছিল। আর দাঁতগুলো এতই ঝকঝকে যে ,হাসলে মনে হতো তুষার দানা। কথা বলার সময় ঝকমক করত সেগুলো। মনে হতো যেন মুখ থেকে নূর বের হচ্ছে।

মাথা,গলা , চুল-দাড়ি

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা স্বাভাবিক বড় এবং গলা ছিল একটু লম্বা। ঈষৎ কোঁকড়ানো চুলে সিঁথি করতে মাঝ বরাবর। মাঝে মাঝে ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল রাখতেন। কখনো বা রাখতেন কানের লতির একটু উপর বা নিচ পর্যন্ত। ঘন ও কালো দাড়িতে ঢেকে থাকতো তাঁর মুখের বেশিরভাগ অংশ। মৃত্যুকালে কানের উপর আর থুতনিতে সব মিলিয়ে প্রায় বিশটি পাকা চুল -দাঁড়ি ছিল।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

নবিজি ﷺ-এর ছিল বড় বড় হাড়। কনুই , কাঁধ , হাঁটু ও কবজি ছিল দীর্ঘকায়। হাত ও পায়ের তালু প্রশস্ত। হাত দুটো রেশমের চেয়েও নরম ,বরফের চেয়েও শীতল এবং মিশকের চেয়েও সুগন্ধময়। তবে পায়ের গোছা ও গোড়ালি ছিল পাতলা। চওড়া কাঁধ রোমশ হলেও প্রশস্ত বক্ষ ছিল চুল বিহীন। শুধু বুক থেকে নাভি পর্যন্ত সুরু এক সারি চুল ছিল।

গড়ন ও আকৃতি

নবি ﷺ বেশি লম্বা ছিলেন না, বেশি খাটোও না। লম্বা নিকটবর্তী ছিলেন। তবুও কোন উঁচু ব্যক্তি যখন নবী ﷺ -এর সাথে হাঁটতেন তখন নবীজি ﷺ-কেই বেশি উঁচু দেখা যেত। শারীরিক গড়ণ ছিল স্বাভাবিক। খুব বেশি মোটাও না আবার খুব বেশি হালকা পাতলাও না ;বরং দুইটির মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলেন।যা দেখতে অত্যন্ত চমৎকার ও আকর্ষণীয় ছিল।

নবিজি ﷺ-এর সুবাস

নবিজি ﷺ-এর শরীর থেকে আতরের চেয়েও মন মাতানো এক সুবাস বেরোনোর কথা বলেছেন সাহাবীগণ। আনাস রা. বলেন , "আমি নবীজির গায়ের সুগন্ধের চেয়ে উত্তম ও মিষ্টতর কোনো সুগন্ধি মিশক, আম্বার কিংবা অন্য কোন কিছুতেই পাইনি।"

জাবির রা.বলেছেন, "নবিজি ﷺ কোন পথ অতিক্রম করলে তারপরে কেউ সে পথ দিয়ে চললে সুগন্ধ সুখেই জেনে যেত যে, এই পথ দিয়ে নবী ﷺ অতিক্রম করেছেন।"কারো সাথে নবীজি হাত মিলালে সারাদিন তার হাতে রয়েছে তো মিষ্টি সুবাস। নবীজি শিশুদের মাথায় হাত বুলাতেন। হলে তার সুবাসিত মাথা শুকলেই অন্য সব শিশুদের থেকে আলাদা করা যেত। উম্মু সুলাইম রা. নবিজি ﷺ-এর ঘাম সংগ্রহ করে একটি শিশিতে করে রাখতেন। পরে আতরের সাথে মেশাচ্ছেন। কারণ নবীজির ঘাম ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ আতর।

চালচলন

নবি ﷺ হাঁটতেন দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপে । বসা থেকে উঠতেন একটু ঝাঁকুনি দিয়ে, হাটতেন দ্রুত কিন্তু মসৃণ গতিতে। মনে হয় তা যেন ঢাল বেন নামছেন। মানুষের দিকে দ্রুত এবং আন্তরিকভাবে ফিরে তাকাতেন।

হাঁটতে গিয়ে কখনো ক্লান্ত মনে হতো না তাকে ।সাথের লোকজন তার সাথে হেঁটে পেরে উঠত না।আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমি নবিজি ﷺ-এর চেয়ে দ্রুত কাউকে হাঁটতে দেখিনি। জমিন যেন ঘটিয়ে আসে তার জন্য। আমরা যতক্ষণে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যাই। তিনি তখনো সচ্ছন্দে হেঁটে চলেছেন।"

কথা ও কন্ঠ

নবিজি ﷺ-এর কন্ঠ কিছুটা চড়া, বাগ্মিতা অসাধারণ।মৌনতা গাম্ভীর্য পূর্ন আর কথা আকর্ষণীয়।একদম যথাযথ বিষয়ে স্পষ্ট ও সংক্ষেপে কথা বলতে পারতেন তিনি।

নবিজি ﷺ-এর আচরণ ও আখলাকের একটুখানি

নবি ﷺ সাধারণত হাসি খুশি থাকতেন ।মুচকি হাসি হাসতেন সবসময়। রূঢ় আচরণের জবাবেও রূঢ়তা দেখাতেন না। চ্যাঁচামেচি করে কথা বলতে না, এমনকি বাজারে গিয়েও না।

দুটি বৈধ কাজের একটি গ্রহণ করার সুযোগ থাকলে রাসুল ﷺ সবাই বেছে নিতেন সহজটি। তবে গুনাহ বা আল্লাহর অবাধ্যতার আশঙ্কা আছে এমন যেকোন কিছু এড়িয়ে যেতেন। ব্যক্তিগত কারণে কখনো প্রতিশোধ নেননি। কিন্তু আল্লাহর আদেশের শাস্তিযোগ্য বিরোধিতা ঘটলে অবশ্যই শাস্তি দিতে অপরাধীকে ।সে ব্যাপারে তার অবস্থান ছিল শক্ত ও সুদৃঢ়।

তাঁর জীবনী আলোচনায় আমরা দেখছি তিনি কতটা দয়ালু, সাহসী , শক্তিশালী ও অসাধারণ ধৈর্যশীল ছিলেন। কখনো কারো সাথে কোন অশ্লীল আচরণ করতেন না। কোন কিছু তার অপছন্দ হলে চেহারা দেখেই বোঝা যেত। সোজাসুজি কারো দিকে অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে তাকাতে না। অন্য কাউকে তো বটেই দাসদের কখনো ধমক দেননি।

আল্লাহর রাসুল হিসেবে মনোনীত হওয়ার আগেও সমাজে তিনি আল আমিন নামে পরিচিত ছিলেন। কথা দিয়ে কথা রাখা আর জয় লাভের পরও বিনীত থাকা তার চিরাচরিত অভ্যাস। আত্মীয়তার বন্ধন কে সম্মান করা,তা যথাযথভাবে বজায় রাখা ,মৃত মুসলিমদের জানাজায় অংশগ্রহণ ,দাসদের কাছ থেকে দাওয়াত পেলে অংশ গ্রহণ করা ,দরিদ্রের পাশে একসাথে বসা ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য সামাজিক বৈশিষ্ট্য। প্রতাপশালী ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক হয়েও তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন আমৃত্যু। বিলাসী খাবারের কিংবা দামি পোশাকে কখনো আসক্ত ছিলেন না তিনি এবং এ নিয়ে কখনো তার মাঝে কোনও প্রতিযোগী মনোভাবও দেখা যায়নি। [বুখারী,৫৪০৯]

[রাসুলে আরাবি ﷺপৃ.৩৫৮-৩৬০]

অধ্যায় ৮:সিরাতে থেকে শিক্ষা

সীরাত থেকে শিক্ষা ও আধুনিক প্রয়োগ

সীরাত (নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবন) আমাদের জন্য এক অমূল্য পথপ্রদর্শক। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে এমন শিক্ষা লুকিয়ে আছে, যা আধুনিক জীবনে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযোজ্য:

1. নেতৃত্ব এবং নেতৃত্বগুণ

- নবী ﷺ তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে একটি ন্যায়পরায়ণ এবং দায়িত্বশীল রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন। যুদ্ধে বা আলোচনায় তিনি কূটনীতিক কৌশল, ধৈর্য ও সমঝোতার গুরুত্ব দেখিয়েছিলেন।

আধুনিক নেতৃত্বে এটি প্রযোজ্য: ব্যবসা, প্রতিষ্ঠান বা কমিউনিটিতে, নেতা হিসেবে শুধুমাত্র ক্ষমতার ভিত্তিতে নয়, দয়া, পরোপকার এবং যুক্তি-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। যেমন, তিনি অনুভূতিশীল ছিলেন, মানুষের কষ্ট বুঝতেন এবং তাদের সঙ্গে ক্ষমাশীল আচরণ করতেন।

2. সহনশীলতা ও ধৈর্য

- মক্কায় নির্যাতন, অপমান এবং বাধার মুখে নবী ﷺ ধৈর্য ধরেছিলেন এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করেছিলেন।

- আধুনিক জীবনে এটা বড় শিক্ষা: বিপদ, প্রতিকূলতা বা সংকট আসলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দিয়ে ধৈর্য ধরে এক-এক ধাপ পরিকল্পনামূলক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

3. কূটনীতি ও সমঝোতা

- হুদাইবিয়ার চুক্তি (Treaty of Hudaybiyyah) এক দৃষ্টান্ত, যেখানে নবী ﷺ সরাসরি সংঘর্ষ না করে আলোচনার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

- আজকের বিশ্বে রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাংগঠনিক সংঘর্ষে আলোচনার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। সীরাত আমাদের শেখায় যে "দাবি ধরে আলোচনার পথ" অনেক বেশি স্থায়ী ফল দিতে পারে।

4. সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলতা ও সামাজিক কল্যাণ

- নবী ﷺ দান, যাকাত, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

- আধুনিক সমাজে গরীব-দরিদ্র, দপ্তরহীনতা, বৈষম্য ইত্যাদির সমাধানে সীরাতের এই দৃষ্টিভঙ্গা অত্যন্ত প্রযোজ্য। সামাজিক ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিমালা তৈরি করার সময় নবীর মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে।

5. সেবামূলক নেতৃত্ব ও নম্রতা

- নবী ﷺ সাধারণ মানুষের সেবা করতেন, তিনিই ন্যায়বিচারিক ও ছিলেন।

- নেতা হিসেবে আধুনিক প্রেক্ষাপটে, সেবা-ভিত্তিক নেতৃত্ব (servant leadership) অত্যন্ত কার্যকর। ক্ষমতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের জীবনের অনুভূতি ও প্রয়োজন বুঝে কাজ করা উচিত।

6. স্থিতিশীলতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা

- সীরাতে দেখা যায় নবী ﷺ সম্পদের সদব্যবহার এবং অপচয় রোধের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

- বর্তমান যুগে পরিবেশ, অর্থনীতি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বশীল ব্যবহার সীরাত থেকে নেওয়া একটি শক্তিশালী নীতিমালা।

7. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ

- নবী ﷺ কেবল রাজনৈতিক নেতা নন, বরং মানুষের আত্মার উন্নয়ন, আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিকতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

- আধুনিক জীবনে যদি আমরা তাঁর শিক্ষাকে কাজে লাগাই, তাহলে শুধু দুনিয়ার সফলতা নয়, আখিরাত-দৃষ্টিকোণেও জীবনের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

অধ্যায় ৯: উপসংহার

নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সীরাত আমাদের জন্য কেবল ইতিহাস নয়, বরং এক চলমান পথপ্রদর্শক। তাঁর জীবন ও সিদ্ধান্তগুলি আজকের জটিল ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ বিশ্বে প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি, বরং আরও বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। নেতৃত্ব, ধৈর্য, দায়িত্ব, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক কল্যাণ – এই সব গুণাবলী তাঁর জীবনে সহজলভ্য ছিল এবং তিনি এগুলোকে বাস্তবায়ন করেছিলেন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করার জন্য।

সীরাত থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা আমাদের আহ্বান করে — আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক দায়িত্ব, পেশাগত সিদ্ধান্ত ও সামাজিক দায়িত্বে নবীর আদর্শ মডেলকে প্রয়োগ করতে। যদি আমরা তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করি, তাহলে আমরা কেবল নিজের জন্যই উন্নতি করতে পারি না, বরং পুরো সমাজকে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিচালিত করতে পারি।

অতএব, সীরাত অধ্যয়ন কেবল অতীতকে জানা নয়, বরং একটি কর্মকৌশল — যা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিদিনকার বাস্তবতায় প্রয়োগ করা যায় এবং যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের উন্নতির পথপ্রদর্শক হতে পারে।